সিকান্দার আবু জাফর নিজেও দুরন্ত কিশোর ছিলেন, ছিলেন প্রবল সাংগঠনিক ক্ষমতাসম্পন্ন। তাঁর জীবনীকার মুন্সী আকরামুজ্জামান তাঁর 'সিকান্দার আবু জাফর স্মৃতি' (সি. আ. জাফর, ১৯৯৯ : ৭০৩-৭১৩) প্রবন্ধে লেখেন যে গল্পকার ফুটবল, ক্রিকেট, ব্যাডমিন্টন ও টেনিস খেলায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। মুন্সী আকরামুজ্জামানের স্মৃতিকথা থেকে আরও জানা যায়, সিকান্দার আবু জাফরের অসাধারণ নেতৃত্বগুণ ছিল। এলাকার যুবকদের তিনি এক করেছিলেন। 'কাহিনী' গল্পের প্রদীপের মধ্যে লেখকের ছায়া পড়েছে।

'ফাকের শেখ' গল্পটি ব্যতিক্রম। এ গল্পে গ্রামীণ সমাজচিত্র মূখ্য হয়নি, বরং গল্পটি চরিত্রপ্রধান। গল্পের নায়ক ফাকের শেখের সুখ্যাতি দিয়ে গল্প শুরু করলেও শেষ করেছেন তার কুখ্যাতির প্রসঙ্গ টেনে। এ গল্পে সিকান্দার আবু জাফর ফাকের শেখকে উদাহরণ মেনে বলেছেন,

"দোষে-গুণে ভরা মানুষ- এদের একের সঙ্গে অপরের পার্থক্য ধরা খুবই শক্ত।" (সি. আ. জাফর, ১৯৯৯: ৪১)

ফাকের শেখকে গল্পকার পাঠকের কাছে মহিমান্বিত করে হুট করে একটা ধাক্কা দেন। সিকান্দার আবু জাফর ফাকের শেখের দ্বিমুখী কার্যকলাপ দেখিয়ে আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন যে মানব-চরিত্র কখনো নিষ্কলুষ নয়; যাকে পীরের মতো ভক্তি করে আসছি, যার কাছে অসাধুতা কখনোই কাম্য নয়, তার হীন-কুটিলতা দেখে আমরা চমকে উঠি, আহত হই তারচেয়ে বেশি। ফাকের শেখ উপোসী প্রতিবেশির জন্য চুরি করতে চায়, কিংবদন্তী রবিনহুড যেমন লুট করত বড়লোকদের এবং লুটের মাল বিলিয়ে দিত দরিদ্রদের। ফাকের শেখ জমির ধান নিয়ে দুই পাড়ার বিবাদ মেটায় নিজের জীবনকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলে। আবার ফাকের শেখই পরস্ত্রী নিয়ে ঘর করতে চায়। সিকান্দার আবু জাফর বেশ নির্মমভাবেই লিখেছেন-

"মিয়াদের কল্যাণে একজনের স্ত্রীকে তার স্বামীর কাছ থেকে জবরদস্তি করে তালাক দিইয়ে নিয়ে অন্য লোকের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া একটা নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। এতে ছেলেরা প্রয়োজনমতো নতুন নতুন বউ পায়। আর সেই অবসরে দু'চারটি টাকা মিয়াদের পকেটে অনায়াসে প্রবেশ করে। দরিদ্র চাষি-পরিবারে শতকরা নব্বইটি বয়স্থা মেয়েই স্বৈরিণী।" (সি. আ. জাফর, ১৯৯৯ : ৪০)

'মাটি আর অশ্রু' গল্পগ্রন্থের গল্পগুলোতে সামন্ত প্রথার নির্মমতার চিত্র বস্তুনিষ্ঠ ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছেন সিকান্দার আবু জাফর। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে সত্যিকারের জমিদাররা জমিদারি হারায়, জমিদারি চলে যায় বেনিয়াদের হাতে। বেনিয়ারা কখনো প্রজার ভালো চায়নি, তারা চেয়েছে শুধু মুনাফা। গল্পগুলোতে দরদি জমিদার পাই না, এতে মনে করা যেতে পারে সিকান্দার আবু জাফর যেসকল সামন্তপ্রভুদের চিত্র এঁকেছেন তারা প্রায় সবাই এই বেনিয়া শ্রেণির। এছাড়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধও গ্রাম-বাংলাসহ সমগ্র ভারতবর্ষের অর্থনীতিকেই বিপর্যস্ত করেছিল। বিপর্যস্ত গ্রামীণ অর্থনীতির করুণ চিত্র এসেছে গল্পগুলোতে। দরিদ্র মানুষগুলো শুধু খেয়ে পরে বাঁচতে চেয়েছে সিকান্দার আবু জাফরের গল্পে, এর বেশি কিছু চাইবার স্বপ্নও তারা দেখত না। 'ফাকের শেখ' ও 'কাহিনী' গল্পদু'টো বাদ দিলে বাদবাকি সব গল্পেই দারিদ্র্য আর ক্ষুধাই গল্পের মূলস্রোত হিসেবে প্রাধান্য পেয়েছে।

লেখক পরিচিতি: **মুহম্মদ মাহমুদুর রহমান,** প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, নবীনগর সরকারি কলেজ ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. আবু জাফর, সিকান্দার (১৯৯৯), সিকান্দার আবু জাফর রচনাবলী তৃতীয় খণ্ড, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

২. হোসেন, মীর মশাররফ (১২৭৯ ব.), জমিদার দর্পণ, কলিকাতা।

৩. সেন, দীনেশ চন্দ্র (১৪০৭ ব.), মৈমনসিংহ গীতিকা, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা।

৪. ইসলাম, রেজাউল (২০১৫), বাংলাদেশ ও বাঙালির ইতিহাস ও সংস্কৃতি দুরন্ত পাবলিকেশন্স ঢাকা।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব

অ্যাডভোকেট সাহিদা বেগম

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় এক অবিচ্ছিন্ন ঘটনা। বাঙালির নিজস্ব স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন প্রচেষ্টার এক সুদীর্ঘ পথ পরিক্রমার ফসল। এই প্রচেষ্টার একটি দীর্ঘ ইতিহাস আছে। এই ইতিহাসে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার রয়েছে একটি গৌরবময় অধ্যায়। বাংলাদেশের স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় এই আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা। এই মামলা থেকেই শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি হৃদয়ের শীর্ষে অবস্থান নেন। শেখ মুজিব বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত হন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ত্বরান্বিত হয়।

১৯৬৮ সালের পাকিস্তানের তৎকালীন সামরিক সরকার প্রধান আইয়ুব খানের বাঙালি নিধনের ঘৃণ্য প্রচেষ্টার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার মধ্য দিয়ে।

ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে একটি সুরক্ষিত সেলে স্বদেশপ্রেম ও জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ বাঙালির মুক্তি আন্দোলনের নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ও ৩৪ জন দেশপ্রেমিক বাঙালি সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তা-কর্মচারিকে দেশদ্রোহীতার অভিযোগে প্রহসনমূলক বিচারের মাধ্যমে ফাঁসির রজ্জুতে ঝুলিয়ে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল পাকিস্তান সরকার।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন দানা বাঁধে এবং '৬৯ সালে অবিস্মরণীয় গণঅভ্যুত্থান ঘটে। এর পরেই '৭০-এ তদানীন্তন পাকিস্তান সরকার দেশে সাধারণ নির্বাচন দিতে বাধ্য হয়। এই মামলার সূত্র ধরে আওয়ামী লীগকে এক অভূতপূর্ব বিজয়ের পথেই শুধু নিয়ে যায়নি বরং সকল শ্রেণির রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনায় মানুষকে একটি চূড়ান্ত লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ করেছিল।

১৯৬৬ সাল থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৬ দফা আন্দোলন তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান তথা পূর্ব বাংলার মানুষের কাছে জনপ্রিয়তা পেতে থাকে। ফিল্ড মার্শাল মো. আইয়ুব খান তখন পাকিস্তানের রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসীন।[১]

পশ্চিমা শাসকদের শাসন, শোষণ, নিপীড়ন, নির্যাতন থেকে মুক্তির একমাত্র সনদ তখন বাঙালির সামনে আওয়ামী লীগের ৬ দফা কর্মসূচি। এই ৬ দফাতে ছিল পাকিস্তানের সকল প্রদেশের স্বায়ত্তশাসনের দাবি। আছে শোষণ আর বঞ্চনা থেকে মুক্তির পথনির্দেশনা। আর আছে বাঙালির অধিকারের কথা। তদানীন্তন সরকারের কাছে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবের একমাত্র দাবি ৬ দফার আলোকে পাকিস্তানের নতুন শাসনতন্ত্র গঠন করতে হবে। বাঙালির প্রাণের দাবি হয়ে উঠল ৬ দফা। শেখ মুজিব বাঙালির ত্রাণকর্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলেন। পাকিস্তান সরকার তথা পশ্চিমা অবাঙালি শাসকরা শঙ্কিত হলো। শুরু হলো শেখ মুজিবের ওপর জেল, জুলুম, নির্যাতন। তবু স্বাধীনতাকামী সংগ্রামী নেতা শেখ মুজিবকে দাবিয়ে রাখা গেল না। শেখ মুজিব তাঁর ৬ দফা কর্মসূচি নিয়ে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে এগিয়ে চললেন বাংলার স্বায়ত্তশাসন আদায়ের লক্ষ্যে।

অন্যদিকে, পাকিস্তান সশস্ত্রবাহিনীর কিছু সংখ্যক বাঙালি অফিসার ও সৈন্য সশস্ত্রবাহিনীর ভেতর বিরাজমান বৈষম্যের কারণে ভেতরে ভেতরে ক্ষুব্ধ হতে থাকে। এই ক্ষুব্ধ অফিসার ও সেনারা অতি গোপনে বাঙালির স্বার্থরক্ষায় সংগঠিত হতে থাকেন। পশ্চিমাদের সাথে থেকে বাঙালির স্বার্থরক্ষা কখনো সম্ভব নয় বুঝতে পেরে এই সেনা সংগঠনটি একটি লক্ষ্যে পৌছে যায়, আর তা হচ্ছে সশস্ত্র বিদ্রোহের মাধ্যমে পূর্ব বাংলাকে স্বাধীন করে ফেলা। এই গোপনীয়তায় তারা কাজ করে যেতে থাকেন। তাঁদের এই কর্মসূচির প্রতি বাঙালির জনপ্রিয় নেতা শেখ মুজিবের পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতা ছিল। কিন্তু পাকিস্তান সরকারের গোয়েন্দা সংস্থার তৎপরতা এবং বিদ্রোহীদের গোপন সংগঠনের দু'জন সদস্যের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে শেষ পর্যন্ত এই বিদ্রোহের কথা সরকারের গোচরে চলে যায়। তাদের একজন ছিলেন সংগঠনের কোষাধ্যক্ষের দায়িত্বে থাকা আমির হোসেন মিয়া। আমির হোসেন মিয়া ছিলেন মদ্যপ এবং অনৈতিক জীবন যাপনে অভ্যস্ত। সংগঠনের তহবিল থেকে অনেক অর্থ সরিয়েছিলেন। এই সংগঠনের মহানায়ক পাকিস্তান নৌবাহিনীতে কর্মরত কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন ১৯৬৭ সালে যখন সংগঠনকে আরো শক্তিশালী করার লক্ষ্যে কর্তব্যরত কর্মস্থল করাচি থেকে তদবির করে বদলি হয়ে পূর্ব পাকিস্তানে এলেন তখন তাঁর কর্মস্থল হলো চট্টগ্রাম নৌঘাটিতে। সংগঠনের কাজ বেগবান করতে গিয়ে হিসেব-নিকেশে ধরা পড়লো আমির হোসেন মিয়ার তহবিল তসরূপের ঘটনা। কমান্ডার মোয়াজ্জেম তাকে চাপ দিলেন সংগঠনের তহবিলের হিসেব

মেলানোর জন্য। আমির হোসেন মিয়া তহবিলের টাকা ফেরত না দিয়ে সংগঠনের কাগজপত্র বুঝিয়ে দিয়ে সংগঠনের সঙ্গে তার সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করলেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই তিনি করাচি গিয়ে সরকারের গোয়েন্দা সংস্থার নিকট সংগঠনের এই গোপন কার্যক্রমের কথা ফাঁস করে দেন।

সংগঠনের গোপন বৈঠকে আমির হোসেন মিয়াকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের দায়িত্ব দেয়া হয় সংগঠনের আর এক গুরুত্বপূর্ণ সদস্য (পরে তিনি রাজসাক্ষী হন) সুবেদার জনাব আশরাফ আলী খানের উপর। আশরাফ আলী খান ছিলেন আমির হোসেন মিয়ার নিকট আত্মীয় এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তিনি আমির হোসেন মিয়াকে তার উপর আরোপিত শাস্তির কথা জানিয়ে তাকে সাবধান করে দেন। একদিকে সরকারের চাপ অন্যদিকে সংগঠনের শাস্তির পরোয়ানা নিয়ে আমির হোসেন মিয়া মামলায় সরকারী সাক্ষী হওয়ার আশ্বাসে সরকারের গোয়েন্দা সংস্থার কাছে ৬৪ পৃষ্ঠার এক প্রতিবেদন দাখিল করেন। শুরু হয় সরকারের গ্রেফতারি তৎপরতা। সারা পাকিস্তান তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেড় হাজার দেশপ্রেমিক বাঙালিকে আইয়ুব সরকারের গোয়েন্দা বাহিনী গ্রেফতার করে।

এরপর পাকিস্তান কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দফতর '৬৮ সালের ৬ জানুয়ারি এক প্রেসনোটে ঘোষণা করে যে, তারা ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বর মাসে পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী এক চক্রান্ত উদঘাটন করেছেন। এই ঘোষণায় ২ জন সিএসপি অফিসারসহ ২৮ জনের গ্রেফতারের খবর প্রকাশ পায়। এতে অভিযোগ করা হয় যে, গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিরা ভারতীয় সহায়তায় এক সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানকে কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন করার প্রয়াসে লিপ্ত ছিলেন। স্বরাষ্ট্র দফতর এরপর '৬৮ সালের ১৮ জানুয়ারি অপর এক ঘোষণায় অভিযোগ করে যে, শেখ মুজিবুর রহমান ও জনাব শামসুর রহমান সিএসপি (সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খানের ভ্রাতা) সহ চক্রান্তে লিপ্ত আছেন।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দফতরের প্রেসনোট
শেখ মুজিব আগরতলা ষড়যন্ত্রের অন্যতম হোতা

ইসলামাবাদ, ১৮ই জানুয়ারি (এ.পি.পি) : আজ এখানে স্বরাষ্ট্র ও কাশ্মীর বিষয়ক (স্বরাষ্ট্র বিষয়ক বিভাগ) দফতর থেকে নিম্নলিখিত প্রেসনোট জারি করা হয়েছে : আগরতলা ষড়যন্ত্রের দায়ে অভিযুক্ত যে আটাশ জনের নাম ইতিপূর্বে ঘোষণা করা হয়েছে তাদের এযাবৎকাল পাকিস্তান প্রতিরক্ষা আইনে আটক রাখা হয়েছিল। সেনাবাহিনী, নৌ-বাহিনী ও বিমান বাহিনীর আইনবলে তাদের ১৯৬৮ সালের জানুয়ারি মাসের ১৮ তারিখে গ্রেফতার করা হয়েছে। কারণ তারা এসব আইনের আওতাভুক্ত নির্দিষ্ট কয়েকটি অপরাধ করেছেন। এই ব্যাপারে তদন্ত অব্যাহত রয়েছে। ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা ও পরিচালনার সাথে শেখ মুজিবুর রহমানের জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া গেছে। কাজেই অন্যান্যদের সাথে তাঁকেও গ্রেফতার করা হয়েছে। পাকিস্তান প্রতিরক্ষা আইনে তিনি পূর্ব থেকেই জেলে ছিলেন।

আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির জরুরি সভায়
“আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগসহ শেখ মুজিবের প্রকাশ্যে বিচার দাবি”

আগরতলা ষড়যন্ত্রের সহিত জড়িত থাকার অভিযোগে অভিযুক্ত শেখ মুজিবুর রহমানকে আত্মপক্ষ সমর্থনের উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা প্রদানপূর্বক প্রকাশ্যে বিচার অনুষ্ঠানের জন্য সরকারের প্রতি আবেদন জানানো হয়। অপর এক প্রস্তাবে শেখ মুজিবের স্বাস্থ্যের বর্তমান অবস্থা এবং তাঁহার অবস্থানের কথা প্রেসনোট আকারে প্রকাশের জন্যও সরকারের প্রতি আবেদন জানানো হয়। ওয়ার্কিং কমিটির সভায় বিভিন্ন প্রস্তাবে বলা হয় যে, আওয়ামী লীগ নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে বিশ্বাসী এবং ৬ দফা কর্মসূচি ও জনগণের অন্যান্য গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ে তাহারা নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন অব্যাহত রাখিবে। প্রস্তাবে দৃঢ়তার সহিত বলা হয় যে, ৬ দফার বাস্তবায়নই দেশের সত্যিকার অখণ্ডতা ও বৃহত্তর সংহতি রক্ষার একমাত্র ভিত্তি বলিয়া আওয়ামী লীগ বিশ্বাস করে।

দৈনিক পাকিস্তান

১৮ জানুয়ারি, ১৯৬৮

এরপর দেশ রক্ষা আইনে '৬৬ সালের ৯ মে থেকে আটক শেখ মুজিব ও গ্রেফতারকৃত অন্যান্য ব্যক্তিদের জেল গেটে মুক্তি দিয়ে আবার সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনী আইনে তাদের আটক করা হয়। এই অবস্থায় তাদের ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে সামরিক হেফাজতে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রথমে সরকারের সিদ্ধান্ত ছিল, গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে কোর্ট মার্শাল করবে, কিন্তু পরবর্তী চিন্তায় পাকিস্তান সরকার ৭০ সালের আসন্ন সাধারণ নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক উচ্চপদস্থ বাঙালি অফিসারদের এই অভিযোগে জড়িত করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা তারা সাজিয়ে তোলে।

মোট ৩৫ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করা হয় আদালতে। অভিযুক্তদের মধ্যে ৩ জন সিএসপি অফিসার, ৩ জন সাধারণ নাগরিক, ১ জন রাজনীতিবিদ এবং তিনি জননেতা শেখ মুজিবুর রহমান। ২৮ জন সশস্ত্রবাহিনীর সদস্য।
৩৫ জন অভিযুক্তের নাম :

অভিযুক্তের নাম	অভিযোগ নম্বর
শেখ মুজিবুর রহমান	১নং
লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন	২নং
স্টুয়ার্ট মুজিবুর রহমান	৩নং
এস.এস.সুলতান উদ্দিন আহমেদ	৪নং
নূর মোহাম্মদ	৫নং
আহমেদ ফজলুর রহমান সি.এস.পি	৬নং
ফ্লাইট সার্জেন্ট মফিজুল্লাহ	৭নং
এ. বি. এম আ. ছামাদ	৮নং
হাবিলদার দলিল উদ্দিন হাওলাদার	৯নং
রুহুল কুদ্দুস সি.এস.পি	১০নং
ফ্লাইট সার্জেন্ট মো. ফজলুল হক	১১নং
ভূপতি ভূষণ চৌধুরী (মানিক চৌধুরী)	১২নং
বিধান কৃষ্ণ সেন	১৩নং
সুবেদার আ. রাজ্জাক	১৪নং

অভিযুক্তের নাম	অভিযোগ নম্বর
হাবিলদার মুজিবুর রহমান	১৫নং
ফ্লাইট সার্জেন্ট আ. রাজ্জাক	১৬নং
সার্জেন্ট জহুরুল হক	১৭নং
এ. বি. মো. খুরশীদ	১৮নং
খান এম. শামসুর রহমান সি.এস.পি	১৯নং
রিসালদার এ. কে. এম. শামসুল হক	২০নং
হাবিলদার আজিজুল হক	২১নং
মাহফুজুল বারী	২২নং
সার্জেন্ট শামসুল হক	২৩নং
কর্নেল শামসুল আলম	২৪নং
মেজর মো. আ. মোতালেব	২৫নং
কর্নেল এম. শওকত আলী	২৬নং
কর্নেল খোন্দকার নাজমুল হুদা	২৭নং
ব্রিগেডিয়ার এ.এন.এম. নুরুজ্জামান	২৮নং
ফ্লাইট সার্জেন্ট (অব.) আ. জলিল	২৯নং
মো. মাহবুব উদ্দিন চৌধুরী	৩০নং
লে. এম.এম.এম. রহমান	৩১নং
সুবেদার এ. কে.এম. তাজুল ইসলাম	৩২নং
মো. আলী রেজা	৩৩নং
ব্রিগেডিয়ার খুরশীদ উদ্দিন আহম্মেদ	৩৪নং
কমান্ডার আবদুর রউফ	৩৫নং

সামরিক আইন প্রশাসক, পাকিস্তানের রাষ্ট্রক্ষমতায় চেপে বসা আইয়ুব খানকে তার পরামর্শদাতারা এই ধারণা দিতে সক্ষম হন যে, ঊনসত্তর সালের প্রথম ভাগের মধ্যে বিশেষ আইনে সামরিক ও বেসামরিক যৌথ উদ্যোগে পূর্ব বাংলায় সশস্ত্র বিদ্রোহ এবং ভারতের সাথে গোপন ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্রের অভিযোগ এনে সংশ্লিষ্টদের বিচার করে রায় প্রদান করলে সে রায়ের ভিত্তিতে পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক উত্থান স্তব্ধ করা যাবে। শেখ মুজিবসহ অনেকের

ফাঁসির দণ্ডাদেশ বা অনেকের দীর্ঘমেয়াদি কারাদণ্ডের ব্যবস্থা হলে ষাটের দশকের ৬ দফাসহ অন্যান্য আন্দোলন কঠোরভাবে দমন হতে বাধ্য। ফলে সত্তর সালের নির্ধারিত সাধারণ নির্বাচন আইয়ুব খান ও তার কনভেশন বা মুসলিম লীগের বিজয় হবে সুনিশ্চিত।

পাকিস্তান পেনাল কোডের সংশোধনী এনে বিশেষ ট্রাইবুন্যাল গঠন করা হয়। ১৯৬৮ সালের ১৯ জুন ৩৫ জনকে আসামী করে এবং দু'শয়েরও অধিক সরকার পক্ষের সাক্ষীর তালিকা নিয়ে পাকিস্তান দণ্ডবিধির ১২১-ক ধারা এবং ১৩১ ধারা মতে মামলার শুনানি শুরু হয়। মামলায় শেখ মুজিবকে ১ নম্বর আসামী করা হয় এবং 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য' এই শিরোনামে মামলাটি দায়ের করা হয়। কুর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে একটি সুরক্ষিত সেনা ছাউনিতে গঠন করা হয় বিচারের এই বিশেষ আদালত বা ট্রাইব্যুনাল। ছোট বিচারকক্ষ। কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে সরিয়ে বন্দীদের তখন ক্যান্টনমেন্টের ভেতর সামরিক হেফাজতে রাখা হয়েছিল।

ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ছবি

তিন সদস্যবিশিষ্ট ট্রাইব্যুনালে প্রধান বিচারপতি ছিলেন বিচারপতি এস. এ. রহমান। তিনি ছিলেন পাকিস্তান সুপ্রীম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি এবং অবাঙালি। অন্য দুইজন ছিলেন বাঙালি এবং পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্টের বিচারপতি এম. আর. খান, অপরজন বিচারপতি মুকসুমুল হাকিম।

মোট ১০০টি অনুচ্ছেদ সম্বলিত মামলার চার্জশিট দাখিল করা হয় আদালতে। সরকার পক্ষে মামলায় ১১ জন রাজসাক্ষীসহ মোট ২১৭ জন সাক্ষীর তালিকা আদালতে পেশ করা হয়। তন্মধ্যে রাজসাক্ষী জনাব কামাল উদ্দিনসহ মোট ৪ জনকে সরকার পক্ষ থেকে বৈরী ঘোষণা করা হয়। বৈরী সাক্ষীদের নাম :

১। এ. বি.এম ইউসুফ
২। কামাল উদ্দিন
৩। বঙ্কিম চন্দ্র দত্ত
৪। আবুল হোসেন[৩]

১৯৬৮ সালের ৫ আগস্ট বৃটিশ আইনজীবী মিস্টার টমাস উইলিয়াম শেখ মুজিবের পক্ষে ট্রাইব্যুনাল গঠনসংক্রান্ত বিধানের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে রিট আবেদন পেশ করেন। তিনি জনাব আবদুস সালাম খান, জনাব আতাউর রহমান খান, খান বাহাদুর নাজির উদ্দিন, খান বাহাদুর ইসমাইল, জনাব জহির উদ্দিন, তরুণ ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম, ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ ও অন্যান্য আইনজীবীদের সাথে একত্রে বিবাদি পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন।

মামলা শুরুর আগে অভিযুক্তদের কয়েকজন যেমন ২নং অভিযুক্ত কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন, সার্জেন্ট জহুরুল হক, এ. বি. খুরশিদসহ আরো ক'জন অভিযুক্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ট্রাইব্যুনালে তারা মামলায় আনা অভিযোগের দায় স্বীকার করবেন। বলবেন, তারা পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা চান এবং সেই লক্ষ্যে তাদের এই প্রচেষ্টা। পূর্ব পাকিস্তানকে কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা তাদের বিরুদ্ধে আনা এই অভিযোগ মিথ্যা নয়, সত্য। কিন্তু অভিযুক্ত পক্ষের প্রধান কৌসুলি জনাব আবদুস সালাম খান পরামর্শ দেন যে, এ অভিযোগ স্বীকার করলে অভিযুক্তদের ফাঁসি ঠেকানো যাবে না এবং মামলায় তাদের হার হবে। তখন শেখ মুজিবের নির্দেশ ও পরামর্শে উক্ত অভিযুক্তরা আইনজীবীদের পরামর্শ মোতাবেক বক্তব্য দেয়ায় সম্মত হন।

সরকার পক্ষে প্রধান কৌসুলি ছিলেন পাকিস্তানের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব মঞ্জুর কাদের ও বাঙালি অ্যাডভোকেট জেনারেল জনাব টিএইচ খান। মামলা চলাকালীন দেশের সংবাদপত্রগুলোতে মামলার প্রতিদিনের কার্যবিবরণী প্রকাশের সময়ে সরকারি নির্দেশে মামলাটির শিরোনামে ছাপা হতে থাকে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'।

মামলার এই শিরোনাম পরিবর্তনের পেছনে তদানীন্তন পাকিস্তান সরকারের উদ্দেশ্য ছিল 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' নাম দিয়ে শেখ মুজিবকে দেশের জনগণের কাছে ভারতীয় ষড়যন্ত্রকারী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী হিসেবে চিহ্নিত ও প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে শেখ মুজিবের ফাঁসি ত্বরান্বিত করা সরকারের পক্ষে সহজ হবে এবং জনসমর্থন সরকারের পক্ষে যাবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য আইয়ুব সরকারের। সরকারের নিক্ষিপ্ত তীর বুমেরাং হয়ে সরকারের বিরুদ্ধেই এসে আঘাত করে।

সরকারি সাক্ষীরা কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে সরকারের বিপক্ষেই বিষোদগার করতে থাকেন। তাঁরা তাদের উপর সরকারের নির্যাতনের কাহিনি করুণ ভাষায় বর্ণনা করতে থাকেন। বিশেষ করে ২নং রাজসাক্ষী কামালউদ্দিন হোসেন সাক্ষী দিতে দাঁড়িয়ে ট্রাইব্যুনালের বিচারকদের সামনে শিশুর মতো হাউমাউ করে কাঁদতে থাকেন এবং তার উপর সরকারের অকথ্য নির্যাতনের বর্ণনা দিতে থাকেন। তিনি কাঠগড়ায় দাঁড়ানো আসামীদের সনাক্ত করতে বললে ভুল সনাক্ত করেন। সার্জেন্ট জহুরুল হককে দেখিয়ে বলেন ইনি শেখ মুজিব। এমনি করে তিনজনকে ইচ্ছাকৃত ভুল সনাক্ত করলে সরকার পক্ষের আইনজীবি তাকে বৈরী ঘোষণা করেন। মূলত কামালউদ্দিন হোসেনের সাক্ষীই মামলাটিকে হালকা করে দেয়। সেসব বর্ণনা পরদিন দেশের সংবাদপত্রগুলোতে ফলাও করে প্রকাশ হতে থাকে।

এই মামলার ব্যাপারে সরকার তার রাজনৈতিক পরামর্শদাতা এবং স্ট্র্যাটেজি নির্ধারকদের পরামর্শমতো আরো একটি ভুল সিদ্ধান্ত নেয়। সিদ্ধান্তটি ছিল পাকিস্তানের দুই অংশের ২১টি ট্রাস্ট পত্রিকার সৃষ্টি করেছিল মামলায় শেখ মুজিবসহ অভিযুক্তদের ভারতের আঁতাত, ষড়যন্ত্রকারী আর দেশদ্রোহী হিসেবে জনগণের মনে বিদ্বেষ ছড়ানোর জন্য এবং সরকারকে সমর্থন করে মামলা সংক্রান্ত সরকারের নেয়া ক্রার্যক্রমের প্রশংসা করে যাওয়ার জন্য। এই সিদ্ধান্তে সরকার পাকিস্তানের দুই অংশের প্রথম শ্রেণির দৈনিক সংবাদপত্রগুলির একজন করে সিনিয়র সাংবাদিককে ট্রাইব্যুনালে আমন্ত্রণ করেছিলেন। বিচার চলাকালে বিচারকার্য পর্যবেক্ষণ করে সংবাদপত্রে কার্যবিবরণী প্রকাশ করার জন্য। এই সুযোগে পূর্ব বাংলার সরকারবিরোধী বাংলা দৈনিকগুলি এ পর্যায়ে দৈনিক ইত্তেফাক ও দৈনিক আজাদ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে ও তার সাংবাদিকেরা দেশপ্রেমের এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন।

এই পত্রিকাগুলি প্রতিদিনের ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রম হুবহু রিপোর্ট করার সাথে সাথে রাজনৈতিক নেতাকর্মী ও সচেতন জনগণের সাথে এই মামলাকে সরকার চক্রান্ত ও বাঙালি নির্যাতনের মিথ্যে মামলা হিসেবে জনগণের সামনে তুলে ধরার সচেতন প্রচেষ্টা চালাতে থাকেন। সরকারের উত্থাপিত অভিযোগ এবং ট্রাইব্যুনালের কাছে দাখিলকৃত সরকারের গোয়েন্দা বাহিনীকর্তৃক উদ্ধারকৃত মামলার বিভিন্ন আলামত থেকে যদিও সাংবাদিকরা বুঝতে পারছিলেন যে, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে সরকারের উত্থাপিত সবটুকু অভিযোগই মিথ্যে বা ভিত্তিহীন নয়। মূল অভিযোগে অবশ্যই সত্যতা রয়েছে। মামলার প্রথম দিকে সরকারি প্রধান কৌসুলি জনাব মঞ্জুর কাদেরের উত্থাপিত অভিযোগ বিবরণী থেকেই সাংবাদিকেরা বুঝতে পেরেছিলেন, প্রকৃতপক্ষেই সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনীর বিক্ষুব্ধ কতিপয় বাঙালি অফিসার কর্মচারিসহ কিছু রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের শেখ মুজিবের সঙ্গে পরামর্শ করে পূর্ব বাংলাকে স্বাধীন করার একটি সশস্ত্র বিদ্রোহের গোপন আয়োজনের প্রস্তুতি ছিল সত্য এবং বাস্তব। তথাপি দেশ, জাতি, জনগণের কল্যাণে ফাঁসির রজ্জু থেকে পঁয়ত্রিশজন দেশপ্রেমিককে উদ্ধারের উদ্দেশ্যে মিথ্যে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা চালাতে থাকেন দেশপ্রেমিক সাংবাদিকেরা। মামলায় পাকিস্তানের প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও পাকিস্তানের অ্যাটর্নি জেনারেল মঞ্জুর কাদের ছিলেন সরকার পক্ষের প্রধান আইনজীবী, তিনি ছিলেন অবাঙালি পশ্চিমা আর বাংলাদেশের টি এইচ খান ছিলেন সরকার পক্ষের অ্যাডভোকেট জেনারেল।

মামলা পরিচালনায় আবদুস সালাম খানের সুদৃঢ় নেতৃত্বে এবং অন্যান্য আইনজীবীদের অদৃশ্য অভিন্ন কৌশল অবলম্বনের কারণে পঁয়ত্রিশজন অভিযুক্ত ব্যক্তিই ট্রাইব্যুনালের সামনে নিজেদের নির্দোষ বলে বলিষ্ঠভাবে ঘোষণা করেন। সরকার যে উদ্দেশ্যে মামলাটি সাঁজিয়েছিল এবং শেখ মুজিবকে মামলায় প্রধান আসামী করেছিল বিচারের সাথে অভিযুক্ত পক্ষের আইনজীবীগণ সেই সুযোগটি সম্পূর্ণরূপে নিজেদের পক্ষে গ্রহণ করলেন। সরকার পক্ষের সাক্ষীদের জেরা করার সময়ে এবং অভিযুক্তদের জবানবন্দিতে বিরোধী আইনজীবীগণ অত্যন্ত সচেতনতার সাথে মামলাটিকে রাজনৈতিক রূপ দেয়ার চেষ্টা করেন। অভিযুক্তদের আইনজীবীগণ এটাই প্রমাণের চেষ্টা করেন যে, এটা সম্পূর্ণভাবেই একটি রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের মামলা এবং এই ষড়যন্ত্রের জাল তৈরি করেছে সরকার নিজেই বাঙালি নেতা শেখ মুজিবকে হত্যার উদ্দেশ্যে।

মামলার সাক্ষীরা বলেছিলেন, সরকার নির্যাতন করে তাদেরকে শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে এই মামলায় মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করেছে, অথচ এই মামলা সম্পর্কে তারা কিছুই জানেন না। ফলে দেশবাসীর কাছে পরিষ্কার হয়ে যায় সরকারই এই ষড়যন্ত্রের হোতা। এই সময় শেখ মুজিবের অনুরোধে মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী সরকারি এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে পল্টন ময়দানে বিশাল জনসভা করে এবং রাজপথে উত্তপ্ত বক্তৃতা বিবৃতি দিয়ে গণআন্দোলন গড়ে তোলেন। রাজপথে তখন বাঙালির দাবি হলো: প্রহসনমূলক ষড়যন্ত্র মামলা মানি না, মানব না! রাজপথে মিছিলের শ্লোগান হলো:

'কুর্মিটোলা ভাঙব
শেখ মুজিবকে আনব'

'কুর্মিটোলা ঘেরাও কর
শেখ মুজিবকে মুক্ত কর'

ইতোমধ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক ইস্যুতে তদানীন্তন পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানের উভয় অংশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি প্রচণ্ড উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ট্রাইব্যুনালের তিনজন বিচারকের মধ্যে দু'জনই ছিলেন বাঙালি। রাজপথের এই গণদাবির মুখে বিচারকেরাও দোদুল্যমানতায় জড়িয়ে পড়েন। আর অভিযুক্তদের ভেতর ফিরে আসে আত্মবিশ্বাস। বিচারের শেষের দিকে তাঁরা ট্রাইব্যুনালে ঢুকতেন দীপ্তপদভারে এবং দেশাত্মবোধক গান গাইতে গাইতে। শেখ মুজিবের প্রিয় গান ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা, আমাদেরই বসুন্ধরা...। সরকার বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। আইয়ুব শাহী বুঝতে পারে গণদাবির বিরুদ্ধে গিয়ে ট্রাইব্যুনালের রায় ঘোষণা করে অভিযুক্তদের ফাঁসি দিলে বা যে কোনো দণ্ড প্রদান করলে তা পাকিস্তানের অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে তুলবে। সুতরাং মামলার রায় ঘোষণা পর্যন্ত অপেক্ষা করা যাবে না। রায় ঘোষণার আগেই অন্য উপায়ে শেখ মুজিবকে হত্যা করতে হবে।

আসামীদের ক্যান্টনমেন্টের ভেতরেই বিভিন্ন জায়গায় রাখা হয়েছিল। শেখ মুজিবকে অন্য তেরোজনের সাথে বন্দী রাখা হয়েছিল ক্যান্টনমেন্টের সিগন্যাল অফিসার্স মেসে। তাঁকে সেখানেই হত্যার ষড়যন্ত্র হয়েছিল। ক্যাম্পাসের বাইরে নির্দিষ্ট স্থানে প্রতিদিন অভিযুক্তদের প্রহরাধীন অবস্থায় কিছু সময় হাঁটানো হতো।

দু'জন গুপ্তঘাতককে শেখ মুজিব সম্পর্কে বর্ণনা দেয়া হয়, দীর্ঘদেহী, গোঁফওয়ালা লোকটি শেখ মুজিব। রুটিন অনুযায়ী প্রতিদিন হাঁটার সময়ে এই দীর্ঘদেহী শেখ মুজিবকে গুলী করে হত্যা করতে হবে। ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৮ শেখ মুজিব প্রহরাধীন অবস্থায় পায়চারী করছিলেন। শেখ মুজিবের ব্যক্তিত্ব ও আকর্ষণ ক্ষমতা ছিল এমন অত্যাশ্চর্য যে, অবাঙালি পাঠানও ছিল তার ভক্ত। সেদিন হত্যার এই গোপন ষড়যন্ত্রের কথা একজন পাঠান ক্যাপ্টেন এসে ত্বরিৎগতিতে তাঁকে জানিয়ে চলে যান এবং শেখ মুজিবকে দ্রুত তাঁর কক্ষে চলে যেতে বলেন। শেখ মুজিব দ্রুত নিজ কক্ষে চলে আসেন। খবরটি অতিদ্রুত বন্দীশালায় ছড়িয়ে পড়লে সে রাতে আর কিছু ঘটেনি।

কিন্তু চরম নৃশংসতা ঘটে পরদিন ১৫ ফেব্রুয়ারি ভোর সাড়ে ছ'টার দিকে। শেখ মুজিবের বন্দি এলাকা থেকে একটু দূরে থার্ড পাঞ্জাব রেজিমেন্টের হেড কোয়ার্টারে বন্দি ছিলেন অপর বাইশজন অভিযুক্ত। ভোরে গার্ডের অনুমতি নিয়ে মামলার ১৭ নম্বর অভিযুক্ত সার্জেন্ট জহুরুল হক ও ১১ নম্বর অভিযুক্ত ফ্লাইট সার্জেন্ট মো. ফজলুল হক তাঁদের নির্দিষ্ট কক্ষের বাইরে টয়লেটে যাবার জন্যে বের হন। সার্জেন্ট জহুরুল হকের ছিল দীর্ঘ দেহ আর মোটা গোঁফ। দেখতে অনেকটা শেখ মুজিবের মতো। মাত্র ছ' থেকে আট ফুট দূর থেকে গুপ্তঘাতক মুখোমুখি গুলি করতে শুরু করে। এই দু'জনের মৃত্যু নিশ্চিত করার জন্য গুলিবিদ্ধ অবস্থায় বেয়নেট চার্জ করা হয় তাদের। সিএমএইচ হাসপাতালে অপারেশনের পর ফজলুল হক বেঁচে যান কিন্তু সার্জেন্ট জহুরুল হক মৃত্যুবরণ করেন।

ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত ছবি

এই হত্যাকাণ্ডের খবর বাইরে প্রকাশ হওয়ার সাথে সাথে বিক্ষুব্ধ বাঙালি ক্ষোভে-বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে বিভিন্ন স্থানে অগ্নিসংযোগ করে। বিক্ষুব্ধ জনতা অন্যান্য ভবনের সাথে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবনেও আগুন দেয়। ফলে মামলার নথিপত্র পুড়ে ছাই হয়।

আর যে ভবনে বাস করতেন ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান এস এ রহমান এবং সরকারপক্ষের প্রধান কৌসুলি জনাব মঞ্জুর কাদের, আক্রমণের মুখে তারা সেখান থেকে পালিয়ে যান। শোনা গেছে, এস. এ. রহমান লুঙ্গি পড়ে পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে সোজা বিমানবন্দরে চলে যান।

জ্বালাও, পোড়াও, ঘেরাও আন্দোলনে ঢাকা তথা সারা পূর্ববাংলা এক অগ্নিগর্ভে পরিণত হয়। '৬৯-এর গণআন্দোলনকে জনতা নিয়ে যায় চরম পরিণতির দিকে, রূপ নেয় গণঅভ্যুত্থানে। এই আন্দোলনের মুখেই শেষ পর্যন্ত আইয়ুব সরকারকে নতিস্বীকার করে ২২ ফেব্রুয়ারি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে নিতে হয় এবং শেখ মুজিবসহ সকল বন্দীকে নিঃশর্ত মুক্তি দেয়া হয়।

পরদিন ২৩ ফেব্রুয়ারি দশ লাখ বাঙালির এক বিশাল জনসভায় শেখ মুজিবসহ অন্যান্য অভিযুক্তদের এক জনসংবর্ধনা দেয়া হয়। এই সভায় শেখ মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। মুহুর্মুহু করতালির মাধ্যমে স্বতঃস্ফূর্ত জনগণ এই উপাধিকে সমর্থন করেন।

তার পরবর্তী ইতিহাস '৭০-এর নির্বাচন এবং আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা অর্জন।[৪]

লেখক পরিচিতি: **অ্যাডভোকেট সাহিদা বেগম,** সহকারি অ্যাটর্নি জেনারেল ও সদস্য, মুজিববর্ষ উদযাপন কমিটি।

তথ্যসূত্র এবং সহায়ক গ্রন্থ:

১. রহমান, শেখ মুজিবুর (২০১২), অসমাপ্ত আত্মজীবনী, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লি., ঢাকা। পৃষ্ঠা. ২৯৫

২. অভিযোগপত্র ট্রাইব্যুনালে দাখিলকৃত (১৯৬৮, ১৯ জুন), অনুচ্ছেদ-১০০।

৩. আহমেদ ফয়েজ (১৯৮২), ট্রাইব্যুনাল কক্ষ থেকে, নওরোজ সাহিত্য সংসদ (নসাস), ঢাকা। পৃষ্ঠা. ৩৩

৪. বেগম সাহিদা (২০০০), আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রাসঙ্গিক দলিলপত্র, গবেষণা বিভাগ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা। পৃষ্ঠা. ৯২৮ (সমগ্র গ্রন্থের আলোকে লেখা)।

স্বাক্ষর, সিকদার আমিনুল হক এবং লিটল ম্যাগাজিনের পরবর্তী অবস্থা

শামীম রফিক

ভূমিকা

ষাটের দশক নানা কারণেই গুরুত্বপূর্ণ। ষাটের দশককে বাংলা কবিতার পরিপূর্ণতা ও আধুনিকতা লাভের দশক হিসেবে ভাবা হয়ে থাকে। ষাটের ষাট হয়ে ওঠার ভিত্তিভূমিতে রয়েছে পঞ্চাশের দশকের কবিদের অবদান, এ কথা সত্য হলেও ষাটের কবিদের অভিজ্ঞতা, ভাবনা, চেতনা এবং প্রচেষ্টা স্বকীয়তায় মহিমান্বিত। এই দশকে বাঙালি জাতীয় জীবনে যেসব মহাপ্রলয় ঘটে যায় তার প্রভাব সাহিত্যকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। তাঁদের রচনার মূলে যে অভিজ্ঞতাগুলো কাজ করেছে সেসব তো ওই দশকে ঘটে যাওয়া ঘটনারই প্রভাব। পুরো ষাটের দশক সমস্ত পৃথিবী জুড়েই যুদ্ধ-বিগ্রহে ছিল উত্তাল। তাই তো তাঁদের কবিতায় ঠাঁই করে নেয় যুদ্ধ, আগুন, বারুদ, বোমা, গুলি, মৃত্যু, হতাশা, রক্ত অথবা প্রতিশোধপরায়ণ উচ্চকণ্ঠ। আবার এই দশকেই কবিরা হয়ে ওঠেন স্বতন্ত্র, চরিত্রমান এবং আধুনিক। এই দশকেই সাহিত্য পেয়ে যায় নতুন বাঁকের সন্ধান। ষাট এক উত্তাল উৎপীড়নের বিরুদ্ধে ঊর্মিমুখর মহাজাগরণের দশক, স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে নির্যাতন ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে জেগে উঠার দশক, স্বপ্নভঙ্গের ফলে নতুন স্বপ্নে বিভোর এক নবজাগরণের দশক। ১৯৪৭ পরবর্তী বাঙালি জীবনে ঘটে যায় নানা পালাবদল। ১৯৫২-তে ভাষা আন্দোলন, '৫৮-তে সামরিক শাসনের জাঁতাকলে গণতন্ত্রের মৃত্যু, '৫৯-এ রোমান হরফে বাংলা লেখার প্রস্তাব, '৬১-তে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী পালনের ওপর সরকারি নিষেধাজ্ঞা জারি, '৬২-তে হামুদুর রহমান শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাতিলের জন্য ছাত্র আন্দোলন, '৬৬-তে স্বাধিকার আন্দোলন, '৬৭ সালে বামপন্থীদের আট দফার আহবান, '৬৮ সালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, '৬৯-এ দুর্বার গণআন্দোলন, '৭০-এ জলোচ্ছ্বাসে ১২ লাখ মানুষের অকাল মৃত্যু, '৭০-এর নির্বাচন এবং '৭১-এ মহান স্বাধীনতা সংগ্রাম। শুধু তাই নয়, প্রাসঙ্গিকভাবেই আসে ১৯৬২ সালে চীন-ভারত যুদ্ধের কথা, যা রাজনৈতিক মেরুকরণের পেছনে বিরাট ভূমিকা রেখেছিল। সেখানেই বাঙালির অর্বাচীন আচরণ ও দূরদর্শিতা থেমে থাকেনি বরং আরো ভয়াবহ রূপ লাভ করেছিল ১৯৬৫-তে পাক-ভারত যুদ্ধে।

মহাযুদ্ধ শুধু ইউরোপ বা আমেরিকার দেশ, সমাজ এবং ব্যক্তিমানসকেই আলোড়িত করেনি, এই ভয়াবহ ও নিষ্ঠুরতম যুদ্ধের ঢেউ সমস্ত পৃথিবীকেই আলোড়িত করেছে। ষাটের দশকে সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন যেমন গড়ে উঠেছিল তেমনি সাহিত্যের নানামুখী আন্দোলনের পাশাপাশি অস্তিত্ব ও আদর্শের লড়াই প্রকট হয়ে উঠেছিল। ওই সময় পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে বাঙালির বুকে প্রতিশোধের বহ্নিশিখা ঘন-ঘোর কল্লোলের সৃষ্টি করেছিল। পঞ্চাশ দশকে আমেরিকায় গড়ে ওঠা 'বিট জেনারেশন' আন্দোলন ষাটের কবি ও লেখকদের নানাভাবে প্ররোচিত করে। বিট আন্দোলনের প্রবক্তা অ্যালেন গিনসবার্গের 'হাউল', এস বরোসের 'ন্যাকেড ল্যাঙ্স' এবং কেরোয়াকস্‌ের 'অন দ্য রোড' প্রকাশের পর তা সমাজে এক নেতিবাচক প্রভাব-প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। ১৯৩০ সালের কবিদের মতোই ষাটের কবিরাও ফরাসি এবং ইউরোপীয় কবিদের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত ছিলেন। ষাটের কবিরা বোদলেয়ারের কবিতাই শুধু নয়, তাঁর জীবনযাপন পদ্ধতিকেও জীবনের আদর্শ হিসেবে অন্ধভাবে অনুকরণ করতে শুরু করেন। এর ফলে ষাটের দশকে পশ্চিম বাংলায় 'হাংরি' এবং 'শ্রুতি' নামে দুটি সাহিত্য আন্দোলন গড়ে ওঠে। তারা সমাজের প্রচলিত প্রথা ভেঙে বেরিয়ে আসতে চায়। ১৯৬২ সালে প্রকাশিত ইশতেহারটির দিকে তাকালেই তাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ধারণা করা যায়। বাংলাদেশের ষাটের দশকের কবিরা 'বিট জেনারেশন' আন্দোলনের মতো 'হাংরি জেনারেশন' আন্দোলন দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছিলেন। অবশেষে বাংলাদেশেও 'স্যাড জেনারেশন আন্দোলন' নামে একটি সাহিত্য আন্দোলন গড়ে ওঠে। এছাড়াও হাংরি ও শ্রুতির মতো 'সাম্প্রতিক' নামক আরেকটি সাহিত্য আন্দোলন গড়ে ওঠে। স্যাড জেনারেশনের মূল লক্ষ্য ছিল পঞ্চাশের ধারা থেকে নিজেদের পৃথক করা। এক্ষেত্রে তারা সফলও হয়েছিলেন। কিন্তু এ সফলতায় ষাটের কবিরা মোটেও তৃপ্ত হতে পারেননি। তারা ভিন্ন মাত্রা এবং ধারার আরো তেজোদীপ্ত, আরো প্রতিবাদমুখর কিছু করতে চেয়েছিলেন। প্রচলিত ধারাকে ভেঙে নতুন ধারার প্রচলন করা। যদিও এই সাহিত্য আন্দোলনগুলো খুব বেশি দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। স্যাড জেনারেশন আন্দোলন তাদের মুখপত্র হিসেবে কাজ করে 'স্বাক্ষর' নামে একটি সাহিত্য পত্রিকা।

সিকদার আমিনুল হক

বিশ শতকের ষাটের দশকের একজন খ্যাতিমান কবি সিকদার আমিনুল হক (১৯৪২-২০০৪)। তিনি আলস্যপ্রিয় মানুষ হলেও শিল্পের ব্যাপারে ছিলেন অত্যন্ত সচেতন, পরম যত্নবান, মেধাবী এবং বুদ্ধিদীপ্ত একজন সচেতন লেখক। তিনি তাঁর শিল্প মানসিকতাকে এ ভূখণ্ডে সীমিত না রেখে বিশ্বময় ছড়িয়ে দিয়েছেন বিশেষত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অলি-গলিতে আর আত্মস্থ করে নিয়েছেন সে সবের নির্যাস, সমৃদ্ধ করেছেন নিজের অভিজ্ঞতাকে, শাণিত করেছেন প্রখর চেতনাবোধকে, নিজেকে আলাদা করেছেন ষাটের গতানুগতিক ধারা থেকে। স্বকীয়তা অর্জনের মাধ্যমে তিনি আজ অনেকের মাঝে উজ্জ্বল। তিনি অহংকারী ছিলেন, মানবিক ছিলেন, যা প্রত্যেক লেখককেই হতে হয়। নিজের ভুবনকে চিনে নিতে হয়। ষাটের বাস্তবতা তিনি কতটা বুঝতেন আমরা তা তাঁর ষাটের বাস্তবতা নিয়ে লেখা পাঁচটি কবিতা। যেমন :

* *পাত্রে তুমি প্রতিদিন জল কাব্যগ্রন্থের 'সাম্প্রতিক মুখোশ' (১৯৮৭ : ৩৭)*
* *বিমর্ষ তাতার কাব্যগ্রন্থের 'ক্রন্দনের ইচ্ছা নেই, তবু' (২০০২ : ৩৩)*
* *বহুদিন উপেক্ষায় বহুদিন অন্ধকারে কাব্যগ্রন্থের 'ষাটের দশক' (১৯৮৭ : ৫৮)*
* *আমরা যারা পাহাড়ে উঠেছি কাব্যগ্রন্থের 'নিশাত সাদানী' (২০০৩ : ৩৭) এবং*
* *পারাবত এই প্রাচীরের শেষ কবিতা কাব্যগ্রন্থের 'এই দশকে' (১৯৮২ : ২২)*

কবিতাগুলো থেকে স্পষ্ট বুঝতে পারি শুধু এ ভূখণ্ডের বাস্তবতা নয় তিনি সমস্ত পৃথিবীর ষাটের বাস্তবতা নিজ হৃদয়ে ধারণ করেছেন এবং আমাদেরকে বুঝতে বাধ্য করেছেন। কিন্তু তিনি ষাটের অন্ধকারে তুর্কিপাগল না হয়ে সচেতনতা ও ধীরতা দিয়ে নিজের করণীয়কে বুঝে নিয়েছেন, স্থির করে নিয়েছেন লক্ষ্য। তিনি শিল্পের সমাকীর্ণ পথকে যে আগে থেকেই নির্দিষ্ট করে নিয়েছিলেন এবং সে লক্ষ্যে স্থির ছিলেন। তিনি অত্যন্ত সচেতন ছিলেন বলেই সকল সমালোচনাকে উপেক্ষা করে, পাঠকপ্রিয়তার ফাঁদে পা না দিয়ে, সফলতা নামক মরীচিকার পেছনে না ছুটে, কোনো লালসায় নিমজ্জিত না হয়ে পথ চলায় অবিচল ছিলেন। একাকী সে পথে হাঁটলেন এবং শেষদিন পর্যন্ত হেঁটে গেছেন। সেই তিনিই ডুবুরির পোশাকে নেমে গেলেন সাগরের অতলান্তে, শেরপা হয়ে উঠে গেলেন পাহাড়ের সুউচ্চ চূঁড়ায় আর আহরণ করলেন অমূল্য সম্পদ। সমৃদ্ধ করলেন বাংলা কাব্যের ভাণ্ডার। তিনি শিল্পের যে ভূখণ্ড বেছে নিলেন তাঁকে করে দিলেন কাণায় কাণায় পূর্ণ।

তিনি বিষয়বৈচিত্র্যে যেমন বিচিত্র করলেন তাঁর কাব্যভুবন, তেমনি শৈলীর মাধুর্যে বহু রঙে রাঙিয়ে করলেন অপরূপ সুষমামণ্ডিত। আমরা যেটাকে বিষয়বস্তুর দুর্বোধ্যতা বলে মনে করছি, সেটা আসলে সিকদার আমিনুল হকের প্রচুর পঠনে আত্মস্থ করা অতি-অভিজ্ঞতা আর পাঠকের কাব্য-জ্ঞানের অনগ্রসরতা। তাঁর কবিতার নারীরা আসলে রক্ত-মাংসের জাগতিক নারী নয়, কাব্যদেবী। নারীর অলক্ষ্যে তিনি কাব্যদেবীকেই আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেছেন। তিনি বিচিত্র ও বহুমুখী। তাঁর শিল্পভুবন আমাদের স্বপ্নভুবনকে রাঙিয়ে ও পরিপূর্ণ করে দেয় মুহূর্তেই।

তিনি কোথায় ছিলেন না? তিনি দেশে ছিলেন, প্রাচ্যে ছিলেন, পাশ্চাত্যে ছিলেন, ষাটে ছিলেন, গদ্যে ছিলেন, পদ্যে ছিলেন, ছড়ায় ছিলেন, রাজনীতিতে ছিলেন, বিপ্লব ও বিদ্রোহে ছিলেন, প্রতিবাদী ছিলেন। তাঁর 'আত্মজের প্রতি' কবিতাকে যদি নির্মলেন্দু গুণের 'হুলিয়া'র সঙ্গে, 'রাশিয়া : স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাকে যদি রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর 'বাতাসে লাশের গন্ধ'র সঙ্গে এবং 'অবিভক্ত পার্টি-লাইন' কবিতাকে যদি রফিক আজাদের 'ভাত দে হারামজাদা'র সঙ্গে তুলনা করি তবে খুব একটা অত্যুক্তি হবে না। তাঁর প্রতিবাদী কণ্ঠ ছিল শিল্পশাসিত স্বমিত-স্বর। তাঁকে যে উপাধিতেই ভূষিত করা হোক না কেন তিনি তাঁর চেয়েও অনেক বেশি সমৃদ্ধ। কবিতার সকল শাখায় তিনি উজ্জ্বল ও বিচরণ করেছেন। বিশ্ব সাহিত্যে ছিল তাঁর অবাধ বিচরণ, তিনি প্রচুর পঠনের মাধ্যমে ঘুরে বেড়িয়েছেন সারা বিশ্ব এবং বিশ্বের সকল সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক অভিঘাতকে তিনি সচেতনভাবেই আত্মস্থ করে নিয়েছেন।

মহৎ শিল্পীর সকল গুণাবলি তাঁর ছিল। সমকালীনদের মধ্যে বিখ্যাত না হলেও তাঁর কবিপ্রতিভা মোটেও কম ছিল না। বরং প্রচার-প্রোপাগাণ্ডা ও অভিজ্ঞতাশাণিত জটিল বিষয়বস্তু নির্ধারণ। সাধনা দ্বারা মানুষ কীভাবে সফলতার চূড়ায় পৌঁছতে পারে, তিনি তাঁর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। মাত্র আটাশ বছরের সাহিত্য সাধনায় দূরের কার্নিশ (১৯৭৫) থেকে আমরা যারা পাহাড়ে উঠেছি (২০০৩) দিয়ে তিনি পাহাড়ের চূঁড়ায় উঠে গেলেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাতে কবিতার বাঁক পরিবর্তন ও রবীন্দ্র-পরবর্তী আধুনিক কবিদের কাব্যচর্চা এবং তিরিশের কবিদের পথরেখা ধরেই চল্লিশ, পঞ্চাশ ও ষাটের

কবিসম্প্রদায় অবিরাম হেঁটেছেন। চল্লিশ, পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের কবিদের কবিতায় প্রাধান্য পায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, দাঙ্গা, দেশবিভাগ, শ্রেণিমুক্তি ও শ্রেণি সংগ্রাম ইত্যাদি। চল্লিশের কবি ফররুখ আহমদ, আহসান হাবীব এবং আবুল হোসেন-এর মাধ্যমে বাংলাদেশের কাব্যধারায় আধুনিকতার সূচনা হয়। চল্লিশের কবিতায় মৌলিকত্ব ও আশা-আকাঙ্ক্ষার দোলা নানাভাবে কবিদের উদ্বেলিত করে, যা তাঁদের কবিতায় ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। তাঁরা তিরিশের আধুনিকতার অনুকরণ কিংবা ইউরোপীয় আধুনিকতার হতাশা আর ক্লান্তি গ্লানির স্রোতে গা ভাসাননি, কৃত্রিম নগরযন্ত্রণায়ও ভোগেননি। তাঁরা বরং বাংলাদেশের মৃত্তিকাসংলগ্ন নিজস্ব কাব্যভাষা ও ইতিবাচক বোধের জগৎ সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছিলেন।

বাংলাদেশের কবিতার ধারায় পঞ্চাশের উল্লেখযোগ্য কবি হলেন : শামসুর রাহমান, হাসান হাফিজুর রহমান, আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ, সৈয়দ শামসুল হক, আল মাহমুদ এবং শহীদ কাদরী প্রমুখ। সমকালীন অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক ও কাব্যিক নানামাত্রিক সংকটসমূহ তাঁদের কাব্যচর্চায় ভাবনার জগতকে সংকীর্ণ করেছে। আধুনিক কাব্যভাষা এবং বিষয়-বৈচিত্র্যে বহুমাত্রিকতা এ দশকে প্রায় নেই বললেই চলে। অনেক সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও পঞ্চাশের কবিদের অর্জন তাৎপর্যপূর্ণ। শামসুর রাহমানের কবিতায় আত্মগত স্বপ্ন-বিক্ষোভ ও শৈল্পিক অভিজ্ঞতার প্রগাঢ়তা দৃশ্যমান। হাসান হাফিজুর রহমানের কবিতায় আরক্তিম সমাজভাবনা ও দার্শনিক চেতনা কাব্যিক ব্যঞ্জনায় উপস্থিত। আল মাহমুদের কবিতায় চিরায়ত বাংলার অপরূপ রূপের রোমান্টিক চেতনার নান্দনিক সমন্বয় ঘটেছে। শহীদ কাদরীর বিষণ্ন নগর চেতনা এ দশকে আধুনিক কবিতার ভিত্তিভূমি নির্মাণ করে।

বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ ও স্বাধিকার আন্দোলনের নাম ষাটের দশক। এ দশকজুড়ে রাজনীতি, সমাজ, সংস্কৃতি ও কবিতা সমান এবং সমান্তরাল ধারায় প্রবাহিত হয়েছে। এ সময়ে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক পালাবদলের পাশাপাশি সাহিত্যের ক্ষেত্রেও ঘটে নানা মেরুকরণ, শিল্প-সাহিত্য পেয়ে যায় নতুন বাঁক ও পথের সন্ধান। প্রসারিত হয় গণ্ডি, বিস্তৃত হয় অবয়ব। এ সময়ের কবিদের চেতনায় যুক্ত হয় নতুন অভিজ্ঞতা এবং নবজাগরণ, যা প্রকাশ পায় তাঁদের কাব্য রচনায়। ষাটের উল্লেখযোগ্য কবিরা হলেন : সিকদার আমিনুল হক, রফিক আজাদ, মোহাম্মদ রফিক, আবদুল মান্নান সৈয়দ, মহাদেব সাহা, আসাদ চৌধুরী, নির্মলেন্দু গুণ, আবুল হাসান, মুহম্মদ নূরুল হুদা ও হেলাল হাফিজ প্রমুখ।

এ দশকের কবিরা পূর্বসূরিদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন, আবার প্রভাবিত করেছেন উত্তরসূরিদেরও। তাঁরা পঞ্চাশকে ডিঙিয়েছেন নিজস্ব মহিমায় এবং সত্তরকে ধরেছেন সমান্তরাল পথের অনুস্মৃতিতে। তাঁদের অনেকেই এখনো কাব্যিক যাত্রা অব্যাহত রেখেছেন। ষাটের দশকে তাঁদের অবস্থান চিহ্নিত করার প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে। সমকালীন রাজনৈতিক সংক্ষুব্ধতা সিকদার আমিনুল হককে বিশেষভাবে আলোড়িত করেছে। পঁচাত্তরে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের পর কবি সাহসী পঙ্‌ক্তিমালা নির্মাণ করেন। পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে কবির বুকে প্রতিশোধের বহ্নিশিখা যেমন জ্বলেছিল তেমনি সে অবরুদ্ধতা থেকে মুক্তির জন্য পাগলপ্রায় হয়ে উঠেছিল তাঁর অন্তপ্রাণ। আত্মসচেতনশীল রোমান্টিক এ কবির কবিতায় নন্দনতত্ত্বে তীব্র আবেগ, প্রেম, অস্তিত্বচেতনা, নিঃসঙ্গচেতনা ও পরাবাস্তববাদী চেতনা লক্ষণীয়। নগরজীবনের নানা ঘটনাপ্রবাহ তাঁর কবিতাকে যেমন বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে, তেমনি নাগরিকমনের নানা কষ্ট-যন্ত্রণা-ক্লেদ-গ্লানি ও সৌন্দর্যময়তা হয়ে উঠেছে তাঁর কবিতার অনুষঙ্গ। চিরায়ত-ঐতিহ্য এবং গ্রামীণ জনজীবনের সম্পর্কের স্বরূপ সন্ধানে তিনি সচেষ্ট ছিলেন।

আবার তাঁর কবিতায় নৈরাশ্যবাদ ও আশাবাদের অবস্থান পাশাপাশি। তাই সিকদার আমিনুল হকের কবিতা আত্ম-চৈতন্যের কবিতা, আত্ম-বৈকল্যের কবিতা, আত্ম-উপলব্ধির কবিতা, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দার্শনিক আত্মকথন। তিরিশের কবিদের মতোই সিকদার আমিনুল হক ফরাসি ও ইউরোপীয় কবি-দার্শনিকদের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত ছিলেন। জীবনদর্শনে সিদ্ধহস্ত সিকদার আমিনুল হক কবিতায় দর্শনচর্চা করেছেন, আবার গদ্যাকারে দীর্ঘ টানা গদ্যকবিতা রচনা করেও সফলতা পেয়েছেন। তিনি সযত্নে কাব্যভাষার শৈলী নির্মাণ করেছেন। প্রতীকী কবিতার প্রতিনিধি তিনি, পরাবাস্তব কবিদেরও একজন। বাংলা কবিতায় তিনি যে স্বতন্ত্র ধারার অবতারণা করেছেন তা শিল্পগুণে সমৃদ্ধ ও স্বতন্ত্র। জীবনের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনাকে তিনি দেখেছেন দূরের কার্নিশে দাঁড়িয়ে একাকী। তাঁর কবিতায় শব্দ-চয়ন, গঠন-বিন্যাস, ছন্দ নির্মিতি এবং অলংকারের ব্যবহার ষাটের অন্য কবিদের থেকে আলাদা। তাঁর শব্দের ভুবন যেমন বর্ণিল, তেমনি কাব্যিকতায় কারুকার্যময়। তিনি ছন্দের কারুময় রূপ নির্মাণে যেমন আস্থাবান ছিলেন, কবিতার শরীরে সযত্নে অলংকার প্রয়োগ করে কবিতার ভুবনকেই নতুন রূপে পাঠকের সামনে হাজির করেছেন।

নিরাভরণ শব্দসজ্জার সহজ স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ তাঁর কবিতায় বিমূর্ত রূপ লাভ করেছে। কবিতায় মিথের ব্যবহার কাব্যকে দিয়েছে জীবন্ত রূপ। উপমা ও রঙের ব্যবহারও লক্ষণীয়। বিষয় ও শৈলীতে নিরীক্ষাপ্রবণ কবি ছিলেন তিনি।

সিকদার আমিনুল হক মনে করেন, 'কেউ কাউকে লেখক তৈরী করেন না– লেখক নিজে হয়ে ওঠে। লেখার কাজ সবচেয়ে নিঃসঙ্গ ও নির্বাসিত কাজ– লেখক সবচেয়ে অসহায় ও নিঃসঙ্গ মানুষ' (১৯৮৮ : ২১)। তিনি জানেন তাঁর কবিতা দুর্বোধ্য এবং সহজপাঠ্য নয়। এ কারণে সমকালীন সময়ে তিনি পাঠকপ্রিয়তা পাচ্ছিলেন না। তা সত্ত্বেও তিনি পথচ্যুত হননি। তিনি জানেন তাঁর পথই যে সঠিক পথ। তাঁর লেখা থেকেই জানতে পারি সে কঠিন সত্যকে। আসলে দুর্বোধ্যতা সিকদার আমিনুল হকের ছিল না– তাঁর ছিল বিশাল সমৃদ্ধ কাব্যসত্তা আর দুর্বলতা ছিল আমাদের জ্ঞানের। যেমন :

* *দূরের কার্নিশ কাব্যগ্রন্থের 'বৃত্তান্ত' (১৯৭৫ : ৪৭) কবিতা*
* *আমি সেই ইলেক্ট্রা কাব্যগ্রন্থের 'আমি ও আমার কবিতা' (১৯৮৫ : ১১) কবিতা*
* *ঈশিতার অন্ধকার শুয়ে আছে কাব্যগ্রন্থের 'জাহাজডুবি' (২০০২ : ১৫) কবিতা*
* *লোর্কাকে যেদিন ওরা নিয়ে গেলো কাব্যগ্রন্থের 'কবি ও কবিতার পাঠক' (১৯৯৭ : ৩১) কবিতা*
* *পারাবত এই প্রাচীরের শেষ কবিতা কাব্যগ্রন্থের 'আমি যেহেতু অন্যদের মতো নই' (১৯৮২ : ৪৩) কবিতা*
* *বাতাসের সঙ্গে আলাপ কাব্যগ্রন্থের 'স্বদেশের চৌকাঠে' (১৯৯৭ : ২২) কবিতা*
* *এক রাত্রি এক ঋতু কাব্যগ্রন্থের 'কবিতা নিজের মতো' (১৯৯১ : ৪০) কবিতা*
* *সতত ডানার মানুষ কাব্যগ্রন্থের 'মৃত্যু অন্য এক শীতল শৈশব' কবিতা (১৯৯১ : ২৭) কবিতা*
* *বিমর্ষ তাতার কাব্যগ্রন্থের 'ছত্রাক তো তাই ভবঘুরে' কবিতা (২০০২ : ২১) কবিতা*

এছাড়াও সুপ্রভাত হে বারান্দা কাব্যগ্রন্থের 'অনাম্নী তোমাকে' (১৯৯৩ : ২৭) এবং সুলতা আমার এলসা কাব্যগ্রন্থেও একই শিরোনামে 'অনাম্নী তোমাকে' (১৯৯৪ : ৩৫) কবিতাটি আছে। এছাড়া পাত্রে তুমি প্রতিদিন জল কাব্যগ্রন্থে 'আমি ও আমার কবিতা' (১৯৮৭ : ৩০) এবং আমি সেই ইলেক্ট্রা কাব্যগ্রন্থে একই শিরোনামে 'আমি ও আমার কবিতা' (১৯৮৫ : ১১) কবিতাটি রয়েছে।

আমি সেই ইলেক্ট্রা কাব্যগ্রন্থের 'বিষ্ণুদে : এক লাল কমলের স্মৃতি' (১৯৮৫ : ৪২) এবং পাত্রে তুমি প্রতিদিন জল কাব্যগ্রন্থের 'বিষ্ণুদে : এক লাল কমলের স্মৃতি' কবিতাটি রয়েছে। সুলতা আমার এলসা কাব্যগ্রন্থে 'একটি ভিলানেল' (১৯৯৪ : ২৭), পাত্রে তুমি প্রতিদিন জল কাব্যগ্রন্থে 'একটি ভিলানেল' (১৯৮৭ : ২৫), আমি সেই ইলেক্ট্রা কাব্যগ্রন্থে 'একটি ভিলানেল' (১৯৮৫ : ২০) এবং বহুদিন উপেক্ষায় বহুদিন অন্ধকারে কাব্যগ্রন্থে 'শেষ কথা নয়' (১৯৮৭ : ৪১) কবিতায় লেখেন : 'শোকার্ত শব্দে কবিতার ভিলানেল'।

সিকদার আমিনুল হক অনেক সনেট রচনা করেছেন। তবে তাঁর সনেটে 'ষটক' ও 'অষ্টক' রীতি থাকলেও অন্ত্যমিল রীতি মানা হয়নি। সেজন্য সেগুলো সনেট বলে বিবেচ্য হবে কি না তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। নিম্নে সিকদার আমিনুল হকের মতে সেসব সনেট বিষয়ক কিছু কবিতা উল্লেখ করা হলো :

* *এ প্রসঙ্গে সিকদার আমিনুল হক তাঁর লোর্কাকে যেদিন ওরা নিয়ে গেলো কাব্যগ্রন্থের 'সুস্থ অন্ধকার' (১৯৯৭ : ১১) কবিতা*
* *সনেটে যে অন্ত্যমিলটা উপেক্ষা করেছেন তা তাঁর লেখা কাফকার জামা কাব্যগ্রন্থের 'প্রথম শব্দটি আসে' (১৯৯৪ : ৩২) কবিতা*
* *এছাড়াও তিনি বিমর্ষ তাতার কাব্যগ্রন্থের 'সামান্য শব্দ' (২০০২ : ৪৮) কবিতা ইত্যাদি।*

লিটল ম্যাগাজিন

'ম্যাগাজিন' শব্দটির আভিধানিক অর্থ বারুদশালা। বারুদশালায় যেমন বারুদ মজুত রাখা হয় তেমনি অক্ষর-শব্দের যেন সংগ্রহশালা পত্রপত্রিকাগুলো। সমস্ত কিছু যাতে পোরা হয় তাই 'ম্যাগাজিন' (বুদ্ধিজীবীর নোটবই ২০১০ : ৫৭১)। ওডওয়ার্ড কেভ সর্বপ্রথম 'ম্যাগাজিন' শব্দটি ব্যবহার করেন। তাঁর সম্পাদনায় লন্ডন থেকে ১৭৩১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ পায় Gentleman's Magazine। 'লিটল ম্যাগাজিন' শব্দটি প্রথম ব্যবহৃত হয়েছিল ইউরোপে আঠারো শতকের শেষ দশকে। সাহিত্য পণ্যসর্বস্ব হয়ে উঠেছিল এবং তা থেকে মুক্তির জন্য, সরে দাঁড়ানোর জন্য, সাহিত্য পত্রিকার প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল। সাহিত্য পত্রিকার মূল ভিত্তি আন্তরিকতা, সততা ও নিষ্ঠা। ব্যক্তিত্বের মর্যাদা ও প্রেরণাই এই সাহিত্যের মূল চালিকাশক্তি। আঠারো শতকের শেষ দশক থেকে এই শতাব্দীর প্রথম দশকে প্রকাশিত এক বিশেষ রীতির পত্রিকাকে 'লিটল ম্যাগাজিন' হিসেবে অভিহিত করা হয়।

বাংলা ভাষার সাহিত্য-সংস্কৃতির সঙ্গে 'লিটল ম্যাগাজিন' ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ১৯৫৩ সালে বুদ্ধদেব বসু 'সাহিত্য-পত্র' প্রবন্ধে প্রথম লিটল ম্যাগাজিন অভিধাটি প্রয়োগ করলেন। ১৯১৩ সালে 'লিটল ম্যাগাজিন' শব্দটি এসেছে শিকাগো থেকে প্রকাশিত মার্গারেট অ্যান্ডারসন সম্পাদিত Little Renieve থেকে। লিটল ম্যাগাজিন পৃষ্ঠা, সংখ্যা ও আয়তনের দিক থেকেও লিটল হয়ে থাকে। কিন্তু 'লিটল' শব্দটি আকার, প্রচার বা সীমিত পৃষ্ঠা সংখ্যা অর্থে এখানে প্রযুক্ত হয়েছে। পুঁজিগত দিক থেকেও লিটল এবং ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গি এখানে কাজ করে না। অপরপক্ষে, 'লিটল ম্যাগাজিন' শব্দটির সাথে সাথে 'বিগ ম্যাগাজিন' শব্দটি দৃষ্টিগোচর হয়। যা কিছু প্রাতিষ্ঠানিক বা ব্যবসায়িক তাই 'বিগ'। লিটল ম্যাগাজিন এই বড় একটা কিছুর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। লিটল ম্যাগাজিন সেই অর্থে প্রতিবাদী ও তথাকথিত প্রতিষ্ঠানবিরোধী। লিটল ম্যাগাজিন নামে লিটল হলেও এই পত্রিকাগুলোই গ্রেট। লিটল ম্যাগাজিনের প্রচার ও প্রসার ঘটে বিংশ শতাব্দীর গোড়ায়। কিন্তু প্রকৃত শুরু ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে। The Dial (১৮৪০-১৮৪৪) পত্রিকাটি লিটল ম্যাগাজিনের আদিরূপ বলা যেতে পারে। ইমেজিস্ট ও সিম্বলিস্ট আন্দোলনের মধ্য দিয়ে লিটল ম্যাগাজিন ব্যাপকতা পেতে শুরু করে। বাংলা সাহিত্যে লিটল ম্যাগাজিনের আদিরূপ প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত 'সবুজপত্র' (১৯১৪)। হঠাৎ একদিনে প্রমথ চৌধুরীর সবুজপত্র তৈরি নয়–এর মূলে আছে তত্ত্ববোধিনী (১৮৪৩) থেকে বঙ্গদর্শন (১৮৭২), ক্লার্ক মার্শম্যানের দিগদর্শন (১৮১৮), ঈশ্বর গুপ্তের সংবাদ প্রভাকর (১৮৩১), প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ সিকদারের মাসিক পত্রিকা (১৮৫৪), দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রবীন্দ্রনাথের সাধনা, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের প্রবাসী (১৯০১), জলধর সেন ও অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের ভারতবর্ষ (১৯১৩) সহ সকল পত্রিকার শতবর্ষব্যাপী সম্মিলিত ভিত্তিভূমি। লিটল ম্যাগাজিনের ধর্ম :

* *স্থিতাবস্থার বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলা ও ভাবানো*
* *সম্ভাব্য বাস্তব নির্মাণ এবং*
* *নতুন চিন্তার প্রচার। (২০১৭ : লিটল ম্যাগাজিন পর্ব-পর্বান্তর ৩৪০)*

লিটল ম্যাগাজিনের কোনো প্রতিশব্দ হয় না। যদিও ছোট কাগজ, অণুপত্র, উজানপত্র বা চড়ুইপত্র ইত্যাদি নামে ডাকা হয়। কিন্তু এতে কি প্রতিশব্দ হয়? সামরিক অর্থে ম্যাগাজিনের অর্থ হলো 'অস্ত্রাগার' আর সাহিত্যিক অর্থে 'মগজাস্ত্র'। অর্থাৎ উভয় অর্থেই অস্ত্র শব্দটি এসেছে। তার মানে এর সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহ, বিপ্লব জড়িয়ে আছে।

কিন্তু কিসের যুদ্ধ? প্রচলনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, প্রচলিত প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ। সময়ের প্রয়োজনে, মানুষের প্রয়োজনে লিটল ম্যাগাজিনের আইডিয়া বা অবয়ব পরিবর্তিত হয়, উপাদানের পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। সকল অন্যায় যখন সংস্কৃতির প্রতি ঢলে পড়ে তখনই প্রয়োজন হয় সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের। সাংস্কৃতিক আগ্রাসন রুখতে প্রয়োজন হয় মগজাস্ত্র, সেই মগজাস্ত্রের ভাণ্ডারই হলো 'লিটল ম্যাগাজিন'। লিটল ম্যাগাজিন মানেই স্থিতাবস্থার বিরুদ্ধে নয়, স্থিতাবস্থায়ও লিটল ম্যাগাজিন চর্চা হতে পারে। সবুজপত্রকে বুদ্ধদেব বসু বাংলা সাহিত্যের প্রথম লিটল ম্যাগাজিন হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন– তা নিয়ে অনেকের যেমন সমর্থন আছে, তেমনি বুদ্ধদেব বসুর বিপক্ষেও আছে নানান যুক্তি। (২০১৭ : লেফট ফ্ল্যাপ, বরেন্দু মণ্ডল) বিকল্প সন্দর্ভের পাশাপাশি লিটল ম্যাগাজিন ধারণ করেছে সেই অতিক্রান্ত সময়ের বহুস্বর ও চিহ্নায়নকে। (২০১৭ : লিটল ম্যাগাজিন পর্ব-পর্বান্তর : প্রসঙ্গকথা)

আলোচনা : সিকদার আমিনুল হক ও স্বাক্ষর

ষাটের লেখকদের একটি জটিল সময়ে আবির্ভূত হয়ে পাড়ি দিতে হয়েছে সর্বদিক থেকে সংক্ষুব্ধ সময়। নির্যাতন, নিপীড়ন, শোষণ, বঞ্চনা, অত্যাচার ছিল নিত্যকার রুটিন। সবকিছু ছাপিয়ে ছিল সর্বগ্রাসী ক্ষুধার ভয়ংকর যন্ত্রণা। তাদের পরনে কাপড় ছিল না, কর্মহীনতার যন্ত্রণায় ছিল জর্জরিত। অপ্রাপ্তি থেকে সৃষ্ট হতাশা তাদেরকে প্রাত্যহিক জীবন থেকে আলাদা করে দেয়। সবকিছুর মধ্যে তারা একটা নৈঞর্থক অর্থ খুঁজে বেড়ান, যা তাদের লেখনীতে প্রবলভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। কর্মহীন পাগলপ্রায় যুবকেরা সেই অবরুদ্ধ জীবন ও সমাজব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য খুঁজে ফেরে নতুন পথের সন্ধান, পেয়েও যান, অধিকাংশে সফলও হন। এই অস্থিরতা সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে ছিল। সর্বপ্রথম ইউরোপে শুরু হয় প্রচলিত প্রথা ভাঙার আন্দোলন, অর্থাৎ সাহিত্য-আন্দোলন।

> ইউরোপে যে সমস্ত আধুনিক কাব্যান্দোলন গড়ে উঠেছিল তার মধ্যে আধুনিক বাংলা কবিতাকে অধিক প্রভাবিত করেছে ফরাসি সিম্বলিস্ট বা সংকেতবাদী কবিতা আন্দোলন, ইংরেজি ইমেজিস্ট বা চিত্রকল্পবাদী আন্দোলন, ফরাসি সুররিয়েলিস্ট বা পরাবাস্তববাদ কবিতা আন্দোলন, এক্সপ্রেশনিস্ট বা প্রকাশবাদী কবিতা আন্দোলন এবং ইমপ্রেশনিজম বা প্রতিফলনবাদ কবিতা আন্দোলন। (২০০৫ : ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় ২৯)

অ্যালেন গিনসবার্গের নেতৃত্বে সর্বপ্রথম আমেরিকায় কবিতার ক্ষেত্রে 'বিট জেনারেশন আন্দোলন' নামে এক সাহিত্য আন্দোলন গড়ে ওঠে, যার ঢেউ আছড়ে পড়ে সমস্ত পৃথিবীময়, বিশেষত সাহিত্য সমাজে এবং তরুণ লেখকদের বুকে। এ প্রসংগে অসীম সাহা তাঁর ষাটের দশক ও 'স্যাড জেনারেশন' আন্দোলন প্রবন্ধে লেখেন:

> এই সময়ে পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে বাঙালি জাতিসত্তার অন্তর্গত বিদ্রোহের অঙ্গার তুষের আগুনের মতো জ্বলতে জ্বলতে একটু একটু করে একটি অগ্নিগর্ভ ভূমিকম্পের রূপ ধারণ করতে থাকলে, তার অভিঘাত পূর্ব-পাকিস্তানের কবি-লেখকদের মধ্যেও যে ঘনঘোর কল্লোলের সৃষ্টি করে, তা তাঁদের কবিতায়, গল্পে, উপন্যাসে কিংবা রাজনৈতিক রচনার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হতে থাকলে রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক নতুন মাত্রা সংযোজন করে। (২০১৩ : নান্দীপাঠ)

ষাটের কবিরা বিট জেনারেশন আন্দোলনের মতো 'হাংরি' জেনারেশন আন্দোলন দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছিলেন। আধুনিক সাহিত্য যাত্রার শুরু মাইকেল মধুসুদন দত্ত থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ, ত্রিশের কবিরা হয়ে ষাটের কবিরা পর্যন্ত সকলেই ফরাসি ও ইউরোপীয় সাহিত্য দ্বারা কোনো না কোনোভাবে প্রভাবিত। ১৯৩০ এর কবিরা ফরাসি ও ইউরোপীয় নানামুখী শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি-চিত্রকলা ও স্থাপত্যদ্বারা নানাভাবে প্রভাবিত ছিলেন। এ থেকে ষাটের কবি বা পশ্চিমবাংলার কবিরাও মুক্ত ছিলেন না। তারা বোদলেয়ারের কবিতাই শুধু নয়, তাঁর প্রাত্যহিক জীবন-যাপন প্রণালিকেও অন্ধভাবে অনুকরণ করেছেন। এ দেশের ষাটের কবিরা বিটের মতো হাংরি দ্বারাও বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত ছিলেন। হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের মুখপত্র প্রকাশিত হয় ১৯৬২ সালে কিন্তু স্যাড জেনারেশন আন্দোলনের মুখপত্র প্রকাশিত হয় ১৯৬৪ সালে। যদিও স্যাড জেনারেশন আন্দোলনের সাথে জড়িত 'স্বাক্ষর' প্রকাশিত হয় ১৯৬৩ সালে। ইশতেহার প্রকাশের আগেই প্রকাশিত হয় স্বাক্ষরের প্রথম সংখ্যা। 'স্বাক্ষর'-এর প্রথম সংখ্যার সম্পাদক ছিলেন যৌথভাবে সিকদার আমিনুল হক ও রফিক আজাদ। তাঁরা 'স্বাক্ষর'-এর প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয়তে লেখেন :

> এ কথা আজ বিনা দ্বিধায় বলা যায় যে, পূর্ব-বাংলায় সাহিত্যের এই ক্রান্তিকালে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার মতো দুঃসাহসিক পত্রপত্রিকা একটাও নেই। যাও দু'চারটে সাহিত্য পত্রিকা আছে, তাতে তথাকথিত প্রতিষ্ঠিত মোগলদেরই আধিপত্য। সেখানে তরুণতম অথচ নিরীক্ষণশীলদের প্রবেশাধিকার নেই।

এই সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতেই তরুণতম নিরীক্ষণশীলদের মুখপত্র স্বাক্ষরের আত্মপ্রকাশ। পরবর্তী সংকলন বর্ধিত কলেবরে মূল্যবান প্রবন্ধ, কবিতা, ছোটগল্প, ব্যক্তিগত বিস্ফোরণ এবং অম্লমধুর সাহিত্যালোচনা নিয়ে আগামী তিন মাসের মধ্যেই বের হচ্ছে। মানসিক পরিণতির দিক দিয়ে যারা নিকট-শৈশবে বাস করছে– তেমন পাঠক- পাঠিকা, অভদ্র বিজ্ঞাপনদাতা, অসৎ এজেন্ট এবং স্বাক্ষর-গোষ্ঠীবহির্ভূত লেখকদের কোনরূপ সহযোগিতার প্রয়োজন নেই। (২০১৩ : নান্দীপাঠ ১৪১)

'স্বাক্ষর' পত্রিকাটির পরপর মোট চারটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। স্বাক্ষর-এর পরবর্তী সংখ্যার সম্পাদকেরা হলেন : আসাদ চৌধুরী, প্রশান্ত ঘোষাল, ইমরুল চৌধুরী ও রণজিৎ পাল চৌধুরী প্রমুখ। ষাটের রাগী কবিরা বিট ও হাংরির আদলে প্রচলিত প্রথাকে ভেঙেচুরে নৈঞর্থক মনন ও মানসিকতায় নিজেদেরকে প্রকাশ করতে থাকে। তাদের বেপরোয়া আচরণ খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তাদেরকে অন্যান্য দশক থেকে আলাদা করে দেয়। সিকদার আমিনুল হক ছিলেন স্যাড জেনারেশন আন্দোলনের সক্রিয় সদস্য এবং নিয়মিত লেখক। স্যাড জেনারেশনের অন্যতম প্রধান প্রবক্তা আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ তাঁর নিজের পত্রিকা 'কণ্ঠস্বর'-এর সম্পাদকীয়তে লেখেন :

যারা সাহিত্যের সনিষ্ঠ প্রেমিক, যারা শিল্পে উন্মোচিত, সৎ, অকপট, রক্তাক্ত, শব্দতাড়িত, যন্ত্রণাকাতর, যারা উন্মাদ, অপচয়ী, বিকারগ্রস্ত, অসন্তুষ্ট, বিবরবাসী; যারা তরুণ, প্রতিভাবান, অপ্রতিষ্ঠিত, শ্রদ্ধাশীল, অনুপ্রাণিত, যারা পংগু, অহংকারী, যৌনতাস্পৃষ্ট, 'কণ্ঠস্বর' তাদেরই পত্রিকা। প্রবীণ মোড়ল, নবীন অধ্যাপক, পেশাদার লেখক, মূর্খ সাংবাদিক, 'পবিত্র' সাহিত্যিক এবং গৃহপালিত সমালোচক এই পত্রিকায় অনাহূত। (২০১৩ : নান্দীপাঠ ১৩৫)

'স্যাড জেনারেশন' তাদের ইশতেহারের শুরুতেই বলেছেন, 'We don't know what we are doing'. তাঁরা এটা কেন বললেন? যা তাঁরা জানেন না, তা কেন করতে চান? এটা কি জেনেশুনে বিষ পানের মতো নয়? নাকি নিজের অজান্তেই, যা তাঁরা জানতেন না। শুধুই কি অন্যান্য দশক বিশেষত পঞ্চাশ দশক থেকে নিজেদেরকে আলাদা করে ফেলা নাকি পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ? খুব সূক্ষ্ম অবলোকনে মনে হয় পঞ্চাশের কবিতার ধারা থেকে তাদেরকে আলাদা করে ফেলা। যেমন ত্রিশের দশকে 'কল্লোল'-এর কবিরা রবীন্দ্রনাথের কবিতা থেকে নিজেদের আলাদা করতে চেয়েছিলেন।

সেক্ষেত্রে ষাটের কবিরা অনেকটাই সফল হয়েছিলেন। তাঁরা কবিতায় আধুনিকতার ক্ষেত্রে নতুন বাঁকের সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। কিন্তু তারা সর্বদা নতুন নতুন সৃষ্টি ও ডাইমেনশনের জন্য ব্যাকুল ছিলেন। সমালোচকেরা মনে করেন :

> স্যাড জেনারেশন যে উদ্দেশ্য নিয়ে গড়ে উঠেছিল, সেখানে উদ্দেশ্যটাই মুখ্য হয়ে উঠেছিল, আদর্শটা বড় হয়ে দেখা দেয়নি। সে কারণে তাঁরা তাদের ইশতেহার প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু তাঁদের আন্দোলনের তাত্ত্বিক ভিত্তিটি কোন প্রপঞ্চের ওপর শক্ত ভিত নিয়ে দাঁড়াবে, তা নির্ধারণ করতে পারেননি। আর এ ধরনের নতুন আন্দোলন তাত্ত্বিক ভিত্তি ছাড়া কোনো অবস্থাতেই তার পায়ের নিচে মাটি খুঁজে পেতে পারে না। স্যাড জেনারেশনের স্বল্পায়ুই তার প্রমাণ। (২০১৩ : নান্দীপাঠ ১৪২)

ষাটের কবিদের সবচেয়ে বড় শক্তি ছিল 'লিটল ম্যাগাজিন।' আন্দোলনকারী প্রতিটি গোষ্ঠীই কোনো না কোনো ছোট কাগজ বা লিটল ম্যাগাজিনের ওপর নির্ভরশীল ছিলেন। এটাও এই সাহিত্য আন্দোলনকারীদের একটি লক্ষণীয় দিক। স্যাড জেনারেশন ১৯৬৩ সালে তাদের মুখপত্র হিসেবে 'স্বাক্ষর' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। সিকদার আমিনুল হক এই 'স্বাক্ষর' এবং 'স্যাড জেনারেশন' আন্দোলনের সাথে সরাসরি যুক্ত ছিলেন।

'স্বাক্ষর' এর চারটি সংখ্যার সম্পাদক ছিলেন যৌথভাবে :

* রফিক আজাদ এবং সিকদার আমিনুল হক।
* ইমরুল চৌধুরী ও প্রশান্ত ঘোষাল।
* প্রশান্ত ঘোষাল ও আসাদ চৌধুরী এবং
* রফিক আজাদ ও রনজিৎ পালচৌধুরী প্রমুখ।

'স্বাক্ষর'-এর মোট চারটি সংখ্যাও প্রকাশিত হয়েছিল। সেই সময় আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ-এর সম্পাদনায় 'কণ্ঠস্বর' পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল।

এছাড়াও ষাটের দশকে আরো কিছু উল্লেখযোগ্য লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয়,

> যেমন : যাত্রিক (১৯৬২), সপ্তক (১৯৬২), স্বাক্ষর (১৯৬৩), যুগপৎ (১৯৬৩), বক্তব্য (১৯৬৩), নতুন বাঁকে নতুন আলো (১৯৬৩), প্রতিধ্বনি (১৯৬৪), সৃজনী, সাম্প্রতিক (১৯৬৪), কণ্ঠস্বর (১৯৬৫), সূর্য ফসল (১৯৬৫), শব্দরূপ (১৯৬৫), কালবেলা (১৯৬৫), ছোটগল্প (১৯৬৬), উল্কা (১৯৬৬), উত্তরা (১৯৬৬), নবদিগন্ত (১৯৬৬), পূর্বলেখ (১৯৬৬), শ্রাবন্তী (১৯৬৬), ত্রিধারা (১৯৬৬), মনীষা (১৯৬৬), এই দশক (১৯৬৬), বনানী (১৯৬৭), না (১৯৬৭), ভেলা (১৯৬৭), বিবিধ (১৯৬৭), পূর্বপত্র (১৯৬৭),

স্বরক্ষেপ (১৯৬৭), ধ্বনি-প্রতিধ্বনি (১৯৬৭), কলতান (১৯৬৭), সন্দীপন (১৯৬৭), বিপ্রতীপ (১৯৬৭), পদধ্বনি (১৯৬৭), কপোত (১৯৬৭), মেঘনা (১৯৬৮), অবেলা (১৯৬৮), আগামী, ইত্যাদি, সাগরদীঘি, বালার্ক (১৯৬৮), সুনিকেত মল্লার (১৯৬৮), অচিরা (১৯৬৮), রৌদ্র-তিমিরে (১৯৬৯), আসন্ন (১৯৬৯), নিবেদিত কবিতাগুচ্ছ (১৯৬৯), সুন্দরম্, শব্দের বিকৃতি (১৯৬৯), নিবেদিত কবিতাগুচ্ছ (১৯৬৯), বাংলার মুখ (১৯৬৯), চরৈবাতি, পাণ্ডুলিপি (১৯৬৯), ইদানীং, নিঃষঙ্গ (১৯৬৯), সৈকত (১৯৬৯), চিরকটি চিরকুট, স্বদেশ (১৯৬৯), অরণি (১৯৬৯), উচ্চারণ (১৯৬৯), নির্ঝর, অনুল্লেখ (১৯৬৯), একান্ত, অন্বেষা, উত্তরমেঘ, অন্তরঙ্গ কবিতাগুচ্ছ (১৯৬৯), সুন্দরম (১৯৭০), শব্দশিল্প (১৯৭০), হে বর্ষ বাংলা বর্ষ (১৯৭০), পঁচিশে বৈশাখ, সূচীপত্র (১৯৭০), স্বরূপ (১৯৭০), স্বরগ্রাম (১৯৭০), বহুবচন (১৯৭০), মুখপত্র (১৯৭০), অধোরেখ (১৯৭০), সমস্বর, হে নক্ষত্রবীথি (১৯৭০), বহুবচন (১৯৭০), শিল্পকলা (১৯৭০) ইত্যাদি।

সত্তরের দশকেও বেশ কিছু লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয়। যেমন : গণসাহিত্য (১৯৭২), কালস্রোত (১৯৭২), মুখপত্র (১৯৭২), অধুনা (১৯৭২), কবি (১৯৭৫), অতলান্তিক (১৯৭৭) ইত্যাদি।

আশির দশকে আবুল কাসেম ফজলুল হক সম্পাদিত লোকায়ত (১৯৮২), মিজানুর রহমানের সম্পাদনায় ১৯৮৩ সালে প্রকাশিত হয় মিজানুর রহমানের ত্রৈমাসিক পত্রিকা। এ পত্রিকার অন্যান্য সংখ্যাগুলো হলো : বৃক্ষ (১৯৮৬), পক্ষী (১৯৮৯), বৃক্ষ ও পরিবেশ (১৯৯১)। নাটকবিষয়ক পত্রিকা থিয়েটারওয়ালা (১৯৯৮), নদী (১৯৯৯), বদরুদ্দীন উমর সম্পাদিত সংস্কৃতি ইত্যাদি। এছাড়াও সংবেদ, প্রান্ত, লিরিক, ছোট কাগজ, অনিন্দ্য, নান্দীপাঠ, অর্ক, প্রেক্ষিত, বীক্ষণ, সমালোচনা, নিসর্গ, মন্তাজ, বিতর্ক, এপিটাফ, প্রতিবুদ্ধিজীবী, নিরন্তর, শ্রাবণ, অরুন্ধ্যতী, আশির দশক ইত্যাদি। শামীম রফিকের সম্পাদনায় ১৯৯৭ সালে আত্মপ্রকাশ করে পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যপত্রিকা : অরণ্য (১৯৯৭) এবং পত্রিকাটি এখনো নিয়মিত বের হচ্ছে।

নব্বই দশকে প্রকাশিত লিটল ম্যাগাজিনসমূহ : জীবনানন্দ, চিহ্ন, ধূলিচিত্র, অমিত্রাক্ষর, মধ্যাহ্ন, মৃত্তিকা, নান্দনিক, সুবাতাস, অন্তরীপ, কালধারা, ভাস্কর, খোয়াব, দ্রষ্টব্য, অ, উটপাখি, রাশ, ছাপাখানা, মঙ্গলসন্ধ্যা, অরণ্য, গদ্য, পথিক, লোক, শালুক, কাশপাতা, কবিধ্বনি, উত্তম পুরুষ, পরাবাস্তব, ব্যাস, বিষয় মানুষ, শুদ্ধস্বর ইত্যাদি।

শূন্য দশকে প্রকাশিত লিটল ম্যাগাজিনসমূহ : লাস্টবেঞ্চ, উল্লেখ, দ্রাঘিমা, ত্রিবেণী, পোয়েট ট্রি, চারবাক, ব্রাত্য, কালনেত্র, দাঁড়কাক, পর্ব, বিবিক্ত, সময়কাল, কাদাখোঁচা, মেইন রোড, ব্রতকথা, শূন্য, শালিক জংশন, ঘুড্ডি, গুহাচিত্র, উতঙ্ক, শতদ্রু, সংজ্ঞা ইত্যাদি। এছাড়াও চট্টগ্রাম, বরিশাল, রাজশাহী, সিলেট, খুলনাসহ সারা দেশ থেকে প্রকাশিত হয় অসংখ্য লিটল ম্যাগাজিন।

ষাটের অন্যান্য মুখপত্রেও সিকদার আমিনুল হককে দেখা গেছে নিয়মিতভাবে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তির আগে ও পরে সিকদার আমিনুল হক গদ্যে ও পদ্যে অবিরল প্রবাহিত হয়েছেন। কবিতা তথা সাহিত্যের প্রতি এরকম নিষ্ঠা বিরল। সিকদার আমিনুল হকের কবিতা প্রসঙ্গে আবদুল মান্নান সৈয়দ তাঁর করতলে মহাদেশ গ্রন্থে লিখেছেন, 'তাঁর কবিতায় কাল্পনিকতা কম-কুহেলি কম-বাস্তবতাও সরাসরি নয় : এ্যাবস্ট্রাক্ট, তাঁরই ব্যক্তিত্বে রঞ্জিত' (আবদুল মান্নান সৈয়দ ১৯৭৯ : ১৯৪)।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে লিটল ম্যাগাজিনের যাত্রা শুরু হলেও বিংশ শতাব্দীতে তার প্রচার ও প্রসার ঘটে। সেই যাত্রা এখনো বহমান। দিনদিন লিটল ম্যাগাজিনের জনপ্রিয়তা ও প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে, সেই সাথে বৃদ্ধি পাচ্ছে গুরুত্ব। নিত্য নতুন আইডিয়া নিয়ে লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশিত হচ্ছে। দেশ বিভাগের পর এদেশে লিটল ম্যাগাজিনের চর্চা বৃদ্ধি পায়। ফজলে লোহানীর সম্পাদনায় অগত্যা (১৯৪৯), মাহবুব-উল-আলম চৌধুরী ও সুচরিতা চৌধুরীর সম্পাদনায় সীমান্ত (১৯৪৭-৫২), যাত্রিক (১৯৫৩), উত্তরণ (১৯৫৮-৬১) পত্রিকাগুলোর মাধ্যমে সেই প্রতিকূল সময়ে সাহিত্যচর্চা টিকিয়ে রেখেছিলেন। ষাটের কথা বলতে গেলে লিটল ম্যাগাজিনকে উপেক্ষা করার কোনো সুযোগ নেই। কবিতাই ষাটের সবচেয়ে সফলতম বিষয়। কবিতা ষাটের কবিকূলকে বিভক্ত করেছে দুই ভাগে। যেমন :

* মধ্য-ষাট ও
* প্রান্ত-ষাট।

মধ্য-ষাট যতটা লিটল ম্যাগাজিনে নিবিষ্ট ছিল, প্রান্ত-ষাট কিন্তু ততটা ছিল না। মধ্য-ষাট কবিদের হাইলি সিরিয়াসনেস কবিতাকে গোপন বীজমন্ত্রের মতো কেবল দীক্ষিতদের জন্য উন্মীলিত ছিল। ফলে কবিতাকে নিঃসঙ্গ, অসামাজিক, অপ্রয়োজনীয় ও দাম্ভিক একটি গৃহবাসী হতে হয়েছিল।

প্রান্ত-ষাটের নবীন যুবারা কবিতাকে সেই কোটর থেকে টেনে বের করে নিয়ে এলো খোলা আকাশের নিচে, রাস্তার পাশে উন্মুক্ত মাঠে। লিটল ম্যাগাজিন নির্ভরতা কিছুটা কমিয়ে এনে এ দেশের কবিতাকে দান করল বহুপথের নিশানা। এভাবে ষাটের কবিতা স্পর্শ করল বিচিত্রতা ও বৈচিত্র্যতাকে। ফলে ষাট থেকে মানুষ পেল :

* শারীরিক কবিতা ও আধ্যাত্মিক কবিতা
* পরাবাস্তব কবিতা ও বাস্তবধর্মী কবিতা
* সমাজধর্মী কবিতা ও আন্তর্জাতিক কবিতা

বিষয়ের দিক থেকে এ রকম যেমন বহু ভিন্ন, তেমনি বিন্যাসেও সে বহুভ্রামণিক : লিরিক ও গদ্যকবিতা, সনেট ও কবিতা-নাট্য এবং দীর্ঘকবিতা। (২০১৭ : বরেন্দু মণ্ডল ৩৮৯-৩৯০)

উপসংহার

ষাটের দশক নানা কারণেই ঊর্মিমুখর ছিল। শুধু যে এ ভূখণ্ডে তা নয়, সমগ্র পৃথিবীজুড়েই ছিল। এ অভিঘাত সামাজিক-রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনেও ছড়িয়ে পড়েছিল। কবিতার আধুনিকায়নে ইউরোপীয় কবিতায় তখন বইতে শুরু করেছিল পরিবর্তনের হাওয়া। শোষণ, নির্যাতন, রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, ক্ষুধা, দারিদ্র্য গ্রাস করে নিল মানুষের চেতনবিশ্ব। দিশেহারা মানুষের এই অভিঘাত সর্বাগ্রে স্পর্শ করল কবিকুলকে। তাঁরা অস্ত্রের পাশাপাশি কলম হাতে নিলো, আর প্রচলিত প্রথা আর ঔপনিবেশিক শাসনের বেড়াজাল থেকে দেশকে বাঁচাতে 'বিট জেনারেশন আন্দোলন' ও 'হাংরি জেনারেশন আন্দোলন'-এর আদলে এ দেশের ষাটের কবিকুল সৃষ্টি করল 'স্যাড জেনারেশন আন্দোলন'। এ আন্দোলনের অগ্রণী ভূমিকায় যে কয়জন ছিলেন তার মধ্যে সিকদার আমিনুল হক অন্যতম। তারা তাদের মুখপত্র হিসেবে 'স্বাক্ষর' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যার যৌথ সম্পাদকের ভূমিকা পালন করেন সিকদার আমিনুল হক। লিটল ম্যাগাজিনের গুরুত্ব বোঝাতে 'স্বাক্ষর' এক বিশাল ভূমিকা রেখেছে। একক ও গোষ্ঠীবদ্ধভাবে বাংলাদেশে অসংখ্য লিটল ম্যাগাজিন নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে।